

হাবীব কাইউম

গীর চকু

গীর চকু

প্রচ্ছদ: সাইফ আলি

বাংলাদেশে তৈরি একটা ব্লেডের প্যাকেটেও কেন ইংরেজিতে Do not wipe blade লেখা থাকতে হবে, নিজামুদ্দিনের মাথায় ঢোকে না। ‘ব্লেড মুছবেন না’—বাংলায় এ রকম লেখা থাকলে কী এমন সমস্যা হতো? দূরের কথা বলে লাভ কী? নিজামুদ্দিনের স্ত্রীই তো Do not wipe blade-এর মানে জানে না। তার স্ত্রী ক্লাশ টেনে উঠেছিলো; কিন্তু পড়েনি। সে সরকারের আদম শুমারিতে শিক্ষিত মানুষের কাতারে আছে। একজন শিক্ষিত মানুষ যদি একটা পণ্যের গায়ে লেখা কথার মানে না জানে, তাহলে সে রকম কথা তোরা লিখিস কেন ব্যাটারা?

তিনি এখন পর্যন্ত প্যাকেট খুলে ব্লেড হাতে নেননি। এ সব ব্লেড মুছলেও খুব একটা কিছু হবে না। এগুলোতে জং ধরে না ঠিক; কিন্তু এক বার কিছু কেটে রেখে দিলে আর ধার থাকে না। আগে এক টাকা দামের বলাকা ব্লেড ছিলো। সেই ব্লেডে জং ধরলেও ধার থাকতো বেশ। মহিলারা এক ব্লেড কিনে কয়েক মাস পার করে দিতো। হাতের সেলাই করতে গেলে সুতা কাটার জন্য বলাকা ব্লেডের বিকল্প ছিলো না তখন। জামা-কাপড়ের সেলাই থেকে বের হয়ে পড়া বাড়তি সুতা কাটতে গেলেও কেঁচির চেয়ে ব্লেড কাজ দেয় ভালো। কেঁচি দিয়ে গোড়া থেকে সুতা কাটা যায় না। যে কাজের জন্য যেটা। ‘কাজ কোরো না বোকার মতো, ব্যবহার করো সঠিক যন্ত্র’—কোথায় যেন তিনি এটা লেখা দেখেছেন। তিনি এখন যে কাজের জন্য বসেছেন, সেটার নাম ক্ষৌর কর্ম। ক্ষৌর কর্মে ক্ষুর থাকা দরকার। ক্ষুর হলো ক্ষৌর কর্মের জন্য সঠিক যন্ত্র। কিন্তু তিনি ব্লেড নিয়েছেন। সুতরাং এটাকে ব্লেড কর্ম বলাই ভালো। ব্লেড শব্দের অর্থ ক্ষুর হলেও বাংলায় ব্লেড আর ক্ষুর এক না। সেলুনগুলোতেও এখন ক্ষুরের খাপে ব্লেড ঢুকিয়ে নাপিতরা কাজ করে। এতে ক্ষুরের অসম্মান হওয়ার কথা। দানেশ চাচা যে ক্ষেতে কালি জিরা ধান চাষ করতেন, সে ক্ষেতে কখনো ইরি ধান চাষ করতেন না। এতে না কি ক্ষেতের অসম্মান হয়। নিজামুদ্দিনের নিজের যেখানে খুব একটা সম্মান নেই, সেখানে তার ক্ষুরের কিছুটা অসম্মান হলে সমস্যা হবে না।

তিনি ক্ষৌর কর্ম শুরু করে দিলেন। তিনি সেলুনে যান দুই মাসে একবার। তার মাথার মাঝখানটা টাক। পিছনের চুল টেনে এনে তিনি সেগুলো ঢেকে রাখেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার বাজানের চুল ছিলো মাথা ভর্তি। তিন ভাগের এক ভাগ চুল পেকেছিলো তার। সেই লোকের পুত্রের মাথায় এমন এক টাক!

তিনি বিশাল কারবারের কোনো পয়সাওয়ালা লোকও না, বুদ্ধিজীবীও না। তারপরও তার মাথায় টাক। অন্য দিকে যে চুলগুলো এমনিতেই লুকানো থাকে, সেগুলো ঝরে পড়ে না। তার বসেরও মাথার সামনে টাক। কিন্তু সেই লোক চূলে সব সময় চাম ছাঁট দেয়।

নিজামুদ্দিনের এই টাক ঢেকে রাখাটা অবশ্য তার স্ত্রী সালেহা পছন্দ করে না। কিন্তু দীর্ঘ দিনের একটা চিত্র পাল্টে ফেললে দেখতে কেমন লাগবে, সেই চিন্তায় তিনি এখনো টাক লুকানোর পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ অনেক দিন মোচ রেখে হঠাৎ যদি ফেলে দেয়, তাকে যে রকম সোজা বাংলায় চোরের মতো লাগে, সে রকম কোনো লাগার কবলে তিনি পড়তে চান না।

নিজামুদ্দিন ক্ষৌর কর্ম ঘরে বসেই করেন। ছাদে গিয়ে কাজটা করতে পারলে ভালো হয়। এ বাড়ির নিচ তলায় গেট একটাই। গেট দিয়ে ঢোকানোর পর বাড়িওয়ালাদের সিঁড়ি উঠে গেছে সোজা; আর ভাড়াটিয়াদের ঘরগুলো চারদিকে সাজানো। ভাড়াটিয়াদের ঘরে টিনের চাল; বাড়িওয়ালার ছাদ। ছাদে উঠতে পারে সবাই। কিন্তু ছাদে গিয়ে এ কাজটা করতে গেলে হঠাৎ যদি বাড়িওয়ালার বৌ উঠে পড়ে, দুজনকেই লজ্জায় পড়তে হবে। ব্যাপারটা আবার কেলেকারিতেও রূপ নিতে পারে। তিনি ছাদে বসে ক্ষৌর কর্ম করছেন আর বাড়িওয়ালী নেমে যাচ্ছে—এই মুহূর্তে তৃতীয় কেউ যদি উঠে পড়ে, সে ভাবতে পারে, সিঁড়িতে তার পায়ের আওয়াজ পেয়েই বাড়িওয়ালী নেমে যাচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তিটি নিজামুদ্দিনের স্ত্রী কিংবা মেয়েও হতে পারে। এ জন্য জানালার সাথে আয়না ঝুলিয়ে তিনি কাজটা সারেন। এতে ঠিক সূক্ষ্ম আর পরিস্কারভাবে সব কিছু আসে না আয়নায়। আয়নাটা জানালার উল্টা দিকে বসাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে সুযোগ নেই। এ অবস্থায় যা দেখা যায় তাতেই কাজ সারতে হয়। এক দিন পরপর তিনি ক্ষৌর কর্মে বসেন। আজ শুক্রবার। ওফিশ ছুটি। আজ ওফিশে যাওয়ার তাড়া নেই। কিন্তু বাজারে যেতে হবে। মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে এখন। প্রথম আর দ্বিতীয় সপ্তাহে বাজারে ভিড় বেশি থাকে। এক দিন মহাখালী থেকে টেক্সিতে এসেছিলেন ওফিশের টুর থেকে। ওফিশ থেকে খরচ দেয়ার কারণেই তিনি টেক্সিতে এসেছিলেন। নিজের কাজ হলে অবশ্যই বাসে আসতেন। টেক্সিওয়ালাও জানালো, মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে যাত্রী ভালো পাওয়া যায়। শেষ দুই সপ্তাহে মন্দা যায়। তার মানে উঁচু পদের চাকরি করে যারা টেক্সিতে

চড়ে, তারাও মাসের শেষ অর্ধেক টানাটানিতে পড়ে। ব্যাংকে গেলেও একই দৃশ্য দেখা যায়। বিদেশ থেকে যাদের টাকা আসে, তাদের টাকা মাসের এক থেকে দশ তারিখের মধ্যে আসে বেশি। পরে আর এদের চাপ অতটা থাকে না। আমাদের দেশে বাংলা মাস গোনা হলে ব্যাংকে গিয়ে চাপের মধ্যে পড়তে হতো না। বাংলা মাসগুলো শুরু হয় ইংরেজি মাসের মাঝখানে। দেশের ওফিশ-আদালত বাংলা মাস গুনে চললে এ ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য চলে আসতো। বিদেশী পয়সাওয়ালারা তখন মাসের শুরুর দিকটা গরম রাখতো; বাকি সময় আবার দেশীদের গরম চলতো। কিন্তু কে করবে বাংলা মাস চালু করার কাজ? দৈনিক কাজে ইংরেজি মাস গুনেও নিজামুদ্দিন কিন্তু ঋতু গোনে বাংলা মাস দিয়েই। তার বাজান প্রতি বছর পঞ্জিকা কিনতেন। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলানো থাকলেও লাল মলাটের মোহাম্মদী পঞ্জিকা দেখতেন তিনি। তার মা লেখাপড়া জানতেন না; কিন্তু শনিতে শনিতে আট গুনে খুব সহজেই বলে দিতে পারতেন, আজ আষাঢ়ের সতেরো তারিখ। পৌষ-মাঘে শীত আসে; আষাঢ়-শ্রাবণে হয় বৃষ্টি—নিজামুদ্দিনও এটাই জানেন। তিনি কেন, তার সমবয়সী সবাই তো মনে হয় এভাবেই ঋতুর হিসাব রাখে। অথচ আজকালকার বইপত্রে বাংলা মাস বাদ দিয়ে লেখা হয় জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে বৃষ্টি হয়!

ঋতু ভুলে যাওয়া অবশ্য এক দিক দিয়ে ঠিক আছে। ঋতু তো হারিয়েই যাচ্ছে। হয় ঋতুর চার ঋতুও নেই এখন। বাংলাদেশ এখন দুই ঋতুর দেশ। গ্রীষ্মকাল আর শরৎ। দুটোই গরমকাল। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গরম আর শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনের গরম। শীত-বর্ষা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে ঋতু মোটে দুইটা। থাইল্যান্ডে না কি সারা বছরই গরম। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশও সে দিকে চলে যাচ্ছে। এ রকম চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বাচ্চাদের বইয়ে লেখা থাকবে : আমাদের দেশের সাথে কোন দেশের ঋতুর মিল আছে, বলতে পারো? থাইল্যান্ডের। থাইল্যান্ডের সাথে আমাদের আরো কিছু মিল আছে। ব্যাংকক শহরে ট্রাফিক জ্যাম অসহনীয়; আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরের অবস্থাও একই। তুমি যদি ব্যাংককের কোনো টেক্সি ড্রাইভারকে দশ কদম দূরের কোনো অপরিচিত জায়গার কথা বলো, সে তোমাকে জায়গাটা না দেখিয়ে দিয়ে টেক্সিতে ওঠাবে এবং কয়েকটা রাস্তা ঘুরিয়ে এনে সেখানে নামিয়ে দেবে। আমাদের ঢাকা

শহরের রিকশাওয়ালারাও এ রকম।

তাদের ওফিশের মঈন সাহেব প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো দেশে ঘুরতে যান। সেখান থেকে এসে ওফিশের প্রত্যেককে চকলেট বিলি করতে করতে সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তার কাছ থেকেই থাইল্যান্ডের ব্যাপারে জেনেছেন নিজামুদ্দিন।

ক্ষৌর কর্মের প্রায় শেষ পর্যায়ে তিনি চলে এসেছেন, এমন সময় মেয়ে এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে গেলো তাকে। বাজার থেকে হয়তো কিছু আনতে বলবে। তিনি যে রকম আয় করেন, তার মেয়ের চাহিদাও সে রকম। বাপকে একটা কিছু বলার আগে অনেক ভেবে নেয়। এরপরও ও এমন কিছু কথার বলে না, যেটা কেনা তার সাধ্যের বাইরে অথবা কিনতে গেলে ধার-দেনা করতে হবে বা সংসারের কোনো দরকারী জিনিশ কেনা বাদ দিতে হবে।

আর দেরি না করে তিনি উঠে পড়লেন। মেয়েকে ডাক দিয়ে বললেন, ‘বাজারের ব্যাগটা দে তো নাবিলা।’

ব্যাগ এনে নাবিলা দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো—বলা ঠিক হবে কি না। তিনিই জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোর জন্য কি কিছু আনা লাগবে?’

‘চুনা জালি পেলে আনবেন একটা।’

‘মোরব্বা বানাবো।’

‘মোরব্বার আর সব মশলা আছে?’

‘আছে।’

‘আচ্ছা, তোর মাকে জিজ্ঞেস করে আয়, কোনো কিছু লাগবে কি না।’

নাবিলার মা এখন রান্না ঘরে। তাদের রান্না ঘর আর গোসলখানা যৌথ। রান্না ঘরে দুটো চুলা। সেখানে পালা করে চার পরিবারের রান্না চলে।

নাবিলা বললো, ‘মাকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না। আদা আনবেন। আদা শেষ হয়ে গেছে।’

বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিজামুদ্দিন দেখলেন গলির মাথায় একটা রিকশা দাঁড়ানো। তাকে দেখে রিকশাওয়ালা নড়ছে না। ও দিকে চোখ পড়ার পর দ্বিতীয় বার আর তিনি তাকালেন না। আবার তাকালে রিকশাওয়ালা নিশ্চিত জিজ্ঞেস করবে, যাবেন কি না। রিকশায় চড়ে বাজারে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। পনেরো টাকা রিকশা ভাড়ার বদলে এক মুঠো শাক

কেনা যায়। আসার সময় যদি বাজারের ব্যাগ বেশি ভারী হয়ে যায় তাহলে রিকশা নিতে পারেন।

একটা সময় নিজামুদ্দিনের চলা খুব কষ্ট হতো। মাসের শেষ দিকে ধার করা লাগতো। কিন্তু পরের মাসে বেতন পাওয়ার পর ঋণ শোধ করে দিলে আবার সেই টানাটানি। সুতরাং আবারো ধার-দেনা। এই চক্র থেকে কষ্ট করে তিনি বেরিয়ে এলেন। এখন তিনি ধারও করেন না; বাকিও খান না। কাউকে ধার দিতেও পারেন না। এই যে এখন বাজারে যাবেন, দেড়শো টাকার বেশি বাজার তিনি করবেন না। যাদের মাপা পয়সা, তাদের বাজারও করা উচিত মেপে মেপে। এই এলাকায় একটা কিম্বারগার্টেন স্কুল আছে। স্কুলের নাম কিডস সেন্টার না কী যেন। সেই স্কুলের দারোয়ান জমির তালুকদার এ রকম মেপে বাজার করে। এক দিন নিজামুদ্দিন দোকান থেকে সদায় কিনছিলেন, তালুকদারও নিচ্ছিলো জিনিশপাতি। সে তেল নিলো আধা পোয়া।

নিজামুদ্দিন জানতে চাইলেন, ‘বেতন পেয়ে একবারে পুরো মাসেরটা কিনলে ভালো হয় না এ রকম না কিনে?’

‘তাতে দ্বিগুণ তেল লাগবে।’

‘কেন?’

‘এই যে এখন আধা পোয়া তেল নেবো, এতে কোনো তরকারি রান্না বাদ থাকবে না। আবার এক পোয়া তেল নিলেও কালকের জন্য এক ফোঁটা থাকবে না বোতলে। এ জন্য এভাবে কিনলেই আমার লাভ।’

বাজারে এসে পুরো বাজারটা একবার চক্কর দিলেন নিজামুদ্দিন। পাঁচটা জিনিশ যদি এক টাকা করে কমে কেনা যায় তাহলে পাঁচ টাকা লাভ। একই বাজারে একটা জিনিশ তিন-চার দামে বিক্রি হয়। এক দাম শুধু ফার্মের মুরগী আর ডিমের বেলায়। ডিম অবশ্য খুব বেশি কেনেন না তিনি। এই সে দিনও যে ডিম আট টাকা হালি কিনেছেন সেই ডিম এখন একটা দশ টাকা। আবার ডিমের দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময় একটা কথাও শুনেছেন একটু আগে। এক লোক বলছে, ‘সরকার দেখা যায় আমাদেরকে বেশ বড়লোক বানিয়ে দিয়েছে। একটা ডিমের দাম দশ টাকা—এটুকু ভাবতে ভাবতেই তো এক থালা ভাত খেয়ে ফেলা যাবে। ছোট বেলা শুনতাম ইলিশ মাছের ঘ্রাণেই না কি এক থালা ভাত খেতে পারতো কেউ কেউ।’

লোকটার সাথে নিজামুদ্দিনের যোগ করতে ইচ্ছা করেছিলো, ‘বোম্বাই মরিচ আর শুঁটকি যারা পছন্দ করে তারাও না কি ঘ্রাণে ঘ্রাণে ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।’ ইচ্ছা করলেও সাধারণত তিনি এ সব কথাবার্তায় যোগ দেন না। কার আবার এতে লেগে যায়, কে জানে! এ রকম এক দিন এক লোককে দীর্ঘ সময় বড়শি নিয়ে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কী ভাই, মাছ মিলছে না?’

সেই লোক ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলো, ‘মজা নিচ্ছেন?’

না, তিনি কাউকে দেখে মজা নিতে চান না। তাকে দেখে মজা নিক অন্যরা। কপালের ঘাম ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কাছিয়ে ফেললেন তিনি।

বাজার নিয়ে কোনো কথা হয় না নিজামুদ্দিনের পরিবারে। তিন বেলা তারা খেতে পারেন—এটাই বিশাল ব্যাপার। তিনি ওফিশে খাবার নিয়ে যান। তবে যারা একটু ভালো বেতন পায় তাদের অনেকেই খাবার আনে না। তারা পার্শ্বল খাবার খায়। এর মধ্যে একটা আছে বাটি সার্ভিস। প্লাস্টিকের বাটিতে ভাত-তরকারি থাকে। ভাতের ব্যবসায়ীরা সেই বাটি দুপুরের আগে দিয়ে যায়; খাওয়া শেষ হলে দুপুরের পরে আবার নিয়ে যায়। বাটি নিয়ে আসে কিশোর বয়সী ছেলেরা। বাড়িতে ওদের মায়েরা হয়তো রান্না করে। খাওয়া শেষ হলে বাটি বা প্যাকেট নিয়ে ওরা যখন নেমে যায় তখন গেটের কাছে এক দল ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ছেলে-মেয়েরা বাটিগুলো থেকে টেঁছেপুছে ছেনে রাখা ভাত-তরকারি নিয়ে যায় ঠোঙ্গায় ভরে। সেই তুলনায় নিজামুদ্দিনের পরিবার হাজারো গুণ ভালো আছে। হিসাব করে চলার কারণেই নিজামুদ্দিনের চা-পানের কোনো অভ্যাস তৈরি হয়নি। তারপরও লোকমান সাহেব তার হাত টেনে মাঝেমাঝে নিয়ে যান আকবরের স্পেশাল চা খাওয়ার জন্য। গরুর দুধের তৈরি চা। লোকমান সাহেবের এক ছেলে আরব আমিরাতে থাকে। তিনি গরুর দুধ দিয়ে তৈরি চা কেন, উটের দুধ দিয়ে তৈরি চাও খেতে পারেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পিছনেই দেওয়ানবাগীর উটের খামার আছে। তবে লোকমান সাহেব সে রকম বেহিশাবী খরচ করেন না। ছেলের জন্য ব্যাংকে টাকা রেখে দেন। ছেলে দেশে এলে যাতে কিছু করে খেতে পারে। তার সাথে নিজামুদ্দিনের কথাবার্তা চলে বেতনাদি নিয়ে। লোকমান সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

‘নিজাম ভাই, গতকাল এনিমেল প্লানেটে দেখলাম একটা কুমির ষাঁড়ের ঠ্যাঙ গিলে ফেললো। এরপর ওরা দেখালো কীভাবে কুমিরের পেটে গিয়ে সেই ঠ্যাঙের নলা টুকরা টুকরা হতে হতে পুরোপুরি হজম হয়ে যায়। আমি ভাবলাম, মানুষ যদি ওভাবে সব কিছু হজম করতে পারতো, তাহলে পৃথিবীতে মাটি-পাথর পাওয়া যেতো না। গাছপালা তো পাওয়া যেতোই না।’ লোকমান সাহেব খারাপ বলেননি। বাজারের ভিতরে-বাইরে সামান্য আয়ের মানুষগুলোর বাজার করা দ্যাখেন তিনি। কেউ বাজারে এসে শুধু আধা কেজি পটল কিনে নিয়ে যায়। কেউ শুধু এক কেজি আলু কেনে। আধা কেজি পটলের দামই চল্লিশ টাকা। এই এক কেজি আলু, আধা কেজি পটল—এ দিয়েই হয়তো তার দু বেলার তরকারি হবে।

নিজামুদ্দিনের পরিবারকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। হয়তো এগারোটা-পাঁচটার হালকা নাস্তা তারা খেতে পারে না; কিন্তু তিন বেলা খেতে তো পারছে। হোক সেটা আলু ভর্তা বা কলমি শাক দিয়ে।

২

সালেহা ঝগড়া করতে পারেন না। বিরোধী পক্ষ থেকে একটা কিছু বললে সেটার জবাব বের করার জন্য তাকে চিন্তা করতে হয়। চিন্তা করতে করতে ও দিক থেকে আরো চারটা কথা চলে আসে। সে কারণে মায়ের সাথে কাউকে ঝগড়া করতে দেখলে নাবিলা আসে ওর মাকে ঘরে নেয়ার জন্য। এখানে ঝগড়া মূলত চুলা নিয়েই হয়। সকাল বেলা সবাই চায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করে ওফিশগামী স্বামী বা স্কুলগামী সন্তানকে বিদায় দিতে। কিন্তু এটা তো আর হোটেলের পরোটা ভাজি না যে, প্রত্যেক দিন একই রুটিন; একই সময়ে শেষ হবে। একেক দিন একেক রকম তরকারি থাকে। সব তরকারি একই সময়ে রান্না হয় না। আবার চাল-ডালেরও নানান পদ আছে। পুরান চালে সময় বেশি লাগে। ডালে ভেজাল থাকলে সে ডালও সিদ্ধ হতে বেশি সময় নেয়। আজকাল বাইরের অনেক দেশ থেকে মুগুরি ডাল

আসে। যখন কারো বেশি সময় লেগে যায়, তখনই সমস্যা হয়। আজ সালেহার দশ মিনিট সময় বেশি লেগেছে। তার রান্না শেষ হওয়ার কথা সাড়ে সাতটায়। সেখানে দশ মিনিট বেশি লেগে যাওয়ায় জিয়াদের মাকে ততক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। দশ মিনিট বসে তিনি তার রাগ কষিয়েছেন। তরকারি রান্নার আগে যেমন মশলাপাতি কষানো হয়, তেমনি তিনিও তার রাগকে দশ মিনিট কষিয়ে তারপর শুরু করেছেন, ‘আপা, আপনি এটা একটা কাজ করলেন? এখন তো ছেলেটাকে না খেয়ে স্কুলে যেতে হবে। ওর আব্বুকেও মনে হয় ওফিশের খাবার দিতে পারবো না। আপনার বেশি রান্না থাকলে আরো আগে আসবেন না? আর না হলে ফ্লাট বাসায় চলে যাবেন, সেখানে নিজের চুলায় নিজের মতো রান্না করবেন। সারা দিন রান্না করবেন। আপনাকে কেউ কিছু বলবে না।’

এতগুলো কথার বিপরীতে সালেহা শুধু বললেন, ‘আপনাদেরও তো মাঝে-মধ্যে দেরি হয়। তখন কি আমি কিছু বলি?’

এর মধ্যে নাবিলা চলে এলো। জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হয়েছে মা?’

তিনি কোনো কথা বললেন না।

নাবিলা তাকে বললো, ‘তুমি ঘরে যাও। খালাম্মা, আমার তো কলেজ এগারোটায়। আমাদের এখান থেকে ভাত নিয়ে আপনি জিয়াদকে আর আংকেলকে বিদায় দি যেন। পরে আপনার ভাত হলে সেখান থেকে আবার নিয়ে আমি আর মা খাবো। হয়ে গেলো। এ নিয়ে ঝগড়া করার কী আছে?’ জিয়াদের মা এতে আরো ক্ষেপলেন। তিনি বললেন, ‘দ্যাখো, মেয়েও এসে যোগ দিয়েছে। কী সুন্দর নসিহত করছে আবার!’

নাবিলা আর কোনো কথা না বলে ওর মাকে নিয়ে ঘরে চলে এলো। ঘরে আসার পর ওর আব্বা জানতে চাইলেন, ‘কী হয়েছে?’

ওর মা বিষয়টা জানালেন। ততক্ষণে ও এসে পড়ার টেবিলে বসেছে। ওর আব্বা ওর মাকে আন্তে আন্তে বললেন, ‘মহিলার তো রাগ হওয়ারই কথা। উনি তোমাকে বলেছেন আগেভাগে রান্না ঘরে যেতে। এটা তো আর বলেনি যে, বিছানা ছাড়তে এত দেরি লাগে যখন, আগে কেন ঢোকেন পাকের ঘরে? আমাদের রান্না শেষ হওয়ার পরে আসবেন; না পারলে হোটেল থেকে খাবার এনে খাবেন।’

সালেহা কিছু বললেন না। চুপচাপ হটপটে খাবার ভরতে লাগলেন। এরপর

ভাত বেড়ে নাবিলাকে ডাক দিলেন।

নিজামুদ্দিন জানতে চাইলেন, ‘শিহাব কোথায়?’

সালেহা বললেন, ‘মনে হয় আজকে প্রথম তুমি ওকে দেখতে পাচ্ছে না!’

‘সপ্তায় দু-একটা দিন তো আমার সাথে বসে খেতে পারে। সকালে চেহারা দেখতে পাই না; রাতে তো পাইই না। দিন দিন গাল যাচ্ছে বসে।’

‘এক শরীরে আর কত? লেখাপড়া, চাকরি, টিউশনি।’

‘আচ্ছা, ও টিউশনিটা না করালে কী হয়? চাকরিটাও বা কী এমন যে, করতেই হবে? যে কোনো একটা ছাড়তে বলো।’

‘ভাইয়া কোনোটাই ছাড়বে না। টিউশনিতে থাকলে চাকরির পরীক্ষায় ভালো করা যাবে। চাকরির কারণে অভিজ্ঞতা বাড়ছে; ভালো চাকরি পেতে গেলে কাজে লাগবে।’ নাবিলা জানিয়ে দিলো।

‘যারা সব একসাথে পেতে চায়, তাদের কিন্তু কোনোটাই ভালোভাবে হয় না। আমার টাকায় তো এত দিন সংসার চলেছে, না কি? ও এখন ভালোভাবে লেখাপড়া করুক।’

‘এ দেশে কি লেখাপড়া দিয়ে চাকরি হয় এখন?’ সালেহা হটপটের বাইরের লেগে থাকা ঝোলের ফোঁটা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন।

‘এ সব বাণী ছেড়ে লাভ নেই। আমাদের জন্য ওটাই গতি। ও তো আর সরকারী চাকরি করবে না; পাবেও না। লেখাপড়া করুক ভালোভাবে; আল্লাহ একটা ভালো উপায় করবেনই। প্রাইভেট চাকরিতে ভাইভা দিতে গেলে পড়ালেখা থেকেই প্রশ্ন করে। কোন ব্রিজে কয়টা পিলার আছে সেটা জানতে চায় না। আর তো মোটে একটা বছর—আরো একটু কষ্ট করলাম না হয় আমরা। এক বছরও না। দশ মাস মাত্র।’

নাবিলা সান্ত্বনা দিলো, ‘আব্বা, আপনি খান তো। সকাল বেলা এত কথা বলার দরকার নেই। আমি ভাইয়াকে বলবো আপনার কথা।’

সালেহা আবার বললেন, ‘তোমাকে না একটা মেয়ের বায়োডাটা দিলাম? খোঁজ নিয়েছো কিছু?’

‘তোমার এই ডাটা এন্ট্রির চাকরি করা ছেলের কাছে কোন বাপ মেয়ে দেবে? আর বৌ এনে রাখবা কোথায়? আমাদের কি বাড়তি কোনো রুম আছে?’

নাবিলাদের দুই রুমের বাসা। দুই রুম বলতে সামনের রুমটাকে ঠিক রুম বলা যাবে না। বারান্দার মতোই। ভিতরের রুমে ওদের মা-আব্বা থাকেন;

সামনের রুমে একটাই খাট পাতা। রুমের মাঝ বরাবর একটা রশি টানানো আছে। শিহাব যদি কোনো দিন বাসায় ঘুমায়, তখন রশিতে পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। খাটে নাবিলা ঘুমায়; নিচে বিছানা পেতে ঘুমায় শিহাব। কিন্তু এটা ঘটে খুবই কম। শিহাব মূলত ঘুমায় ওর বন্ধুদের সাথে মেসে। নাবিলা বড় হয়েছে। দুই ভাই-বোনের একই রুমে ঘুমানো বিরাট অস্বস্তির ব্যাপার। এ রকম দিনগুলোতে মাঝেমধ্যে ওদের আঝা এসে সামনের খাটে আগেভাগেই গুয়ে পড়েন। তখন নাবিলাকে বাধ্য হয়ে ভিতরে গিয়ে ওর মায়ের সাথে শুতে হয়।

যে রাতে পিঠা-মিঠার ব্যাপার থাকে বা ওর আঝা বিশেষভাবে বলেন থাকতে, সে দিনই কেবল শিহাব থাকে। থাকে বলতে ও মেসে চলে যেতে চায়; কিন্তু ওর আঝা ডেকে নানান কথা বলে রাত বারোটা বাজান। তখন ওর মা বলেন, ‘এখন এই রাতে কোথায় যাবি? রাস্তা-ঘাটে কোনো নিরাপত্তা আছে?’

সালেহা বললেন, ‘বিয়ের কথা শুরু করলেই কি বিয়ে হয়ে যাবে? তুমি খোঁজ-খবর নিতে থাকো। এর মধ্যে যদি শিহাবের কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়...।’

‘বিয়ে হতে সময় লাগে মানে? দুনিয়ার সবচেয়ে সৎক্ষিপ্ত কাজের নাম হলো বিয়ে।’

নাবিলা বুঝলো, ওর মা অস্বস্তি বোধ করছেন। ওর সামনে ওর আঝা এ সব কথা বলছেন, এ জন্য তিনি ওর আঝাকে চোখ রাঙিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা, তুমি খোঁজ না নিতে চাইলে নিও না। এত কথা বলার দরকার নেই। চুপ করে থাক। আমিই খোঁজ নেবো।’

‘ব্যাপার কী? তোমার কোনো বান্ধবীর মেয়ে না কি? ছোট বেলায় কথা দিয়েছিলো, তোমার ছেলে হলে আর তার মেয়ে হলে বিয়ে দেবা?’

‘তোমাকে না চুপ করে খেতে বলেছি?’

নাবিলা মুচকি হাসলো। ওর আঝা বললেন, ‘কী রে, তুই হাসছিস কেন? তুই কি চিনিস? সত্যিই তোর মায়ের বান্ধবীর মেয়ে?’

নাবিলা ওর মায়ের দিকে তাকালো।

ও নিজেও চায় না ওর ভাইয়ার এখন বিয়ে হোক। ও চায় ওর বিয়েটা আগে

হোক। ও যে এখন সব কিছু বুঝতে পারে, সেটা কি ওর মা-আব্বা জানেন? ওর আব্বা ফিসফিস করে ওর মাকে অনেক কিছু বলে। সেগুলো ও শুনতে পায়। শুনে ওর কান গরম হয়ে যায়। ও তখন দরজা খুলে বাথরুমে চলে যায়। বাথরুমে গিয়ে কানে পানি দেয়।

ওর মা কেন আগে ছেলের বিয়ে দিতে চাইছেন ও নিজেও বোঝে না। মায়েরা তো সব সময় মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত থাকে। কিন্তু ও যে একটা কালো মেয়ে, ওর বিয়ে দিতে গেলে অনেক কষ্ট হবে, সেটা কি ওর মা বোঝেন না?

ও নিজে নিজে ভেবে এ বিষয়ে দুটো যুক্তি বের করেছে। ওর মা জানেন যে, তার মেয়ে কালো। এই মেয়ের বিয়ে হতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সুতরাং মেয়ের চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দিই। অথবা হয়তো তিনি এ নিয়ে কিছু ভাবছেনই না। তিনি ভাবছেন, নাবিলা মেয়ে মানুষ। হুট করে এক দিন ওর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন তিনি একা হয়ে যাবেন। সে জন্য ঘরে ছেলের বৌ আনতে চান। তৃতীয় আরেকটা বিষয় ওর মায়ের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা থেকে ও উদ্ধার করতে পেরেছে। সেটা হলো, ওর মা চেয়েছিলেন তার আরো সন্তান হোক। তারা চার বোন। প্রত্যেকেরই একটা করে মেয়ে। সৌভাগ্যক্রমে তার দুটো সন্তান হয়েছে। ওর পরে ওর মা অনেক চেয়েছেন আরেকটা সন্তান হোক। তিনি হয়তো আরো একটা ছেলে কামনা করেছিলেন। নাবিলাও ভাবে, ওর পরে একজন থাকলে ভালো হতো। তবে সেটা ভাই না। অবশ্যই বোন। ছেলেরা বাইরে বন্ধুর সাথে নিজের সব কিছু বলতে পারে। মেয়েরা পারে না। মেয়েরা একসাথ হলে অনেক কথা বলে। কিন্তু নিজের কিছু কথা থাকে, যেগুলো শুধু নিজের বোনের কাছেই বলা যায়।

এখন ওর ভাইয়াই ওর মা-খালাদের একমাত্র ছেলে। সে জন্য ওর খালারাও এসে ওর মায়ের সাথে তাল মিলান। বিয়ের খরচাপাতি সব তারা তিন বোন মিলে দেবেন। সে জন্য তারা এলে শিহাব ভুলেও বাসায় পা দেয় না। ফোনে ফোনে বলে, ‘খালা, আমি পরীক্ষার পরেই আপনাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। আগামী মাসেই পরীক্ষা শেষ হবে। কালকে পরীক্ষা আছে। একটু পড়তে হবে। রাখি খালা। আল্লাহ হাফেজ।’

ওর খালারা যদি দেখেন তাদের ছেলে পড়ালেখা, টিউশনি আর চাকরির চাপে চাপা ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে, তারা নিশ্চিত সাথে সাথে বলবেন, ‘তুই সব

বাদ দে। তোর কিছু করা লাগবে না।’

তারা শুধু এটাই বলতে পারবেন। কিন্তু কীভাবে তার আয়-রোজগারের সুন্দর একটা ব্যবস্থা হবে, সেটা নিয়ে তারা কিছু বলতে পারবেন না। শিহাব না হয় টিউশনি-চাকরি সব ছেড়ে দিলো। তখন খালারা হাত খরচ দেবেন, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কত দিন? আর শিহাব কি সেটা নেবে? ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সে লেখাপড়ার কোনো খরচ ঘর থেকে নেয়নি।

নাবিলাও দুটো টিউশনি করায়। এতে ওর খাতা-কলম কেনার খরচ মোটামুটি হয়ে যায়। ইন্টারে পড়ে টিউশনি পাওয়া সহজ কথা নয়। টিউশনিগুলো স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ। আর যাদের ফুটানি আছে, তারা তো তাদের ক্লাশ ওয়ানে পড়া বাচ্চার ইংরেজি পড়ানোর জন্যও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজির ছাত্র খোঁজে; অঙ্কের জন্য খোঁজে বুয়েটের ছাত্র। মেয়েদের জন্য অবশ্য টিউশনি পাওয়া ছেলেদের তুলনায় সহজ। যাকে পড়াতে হবে সে যদি ছাত্রী হয় তাহলে কোটাধিকার বলে মেয়েরা সে টিউশনিটা পেয়ে যায়।

৩

নাবিলা ওর মা-বাপ—দুজনেরই বৈশিষ্ট্য পেয়েছে চেহারার মধ্যে। রং পেয়েছে বাপের; আকৃতি পেয়েছে মায়ের। বাপ কালো; মা ফর্সা। ফর্সা মানে বাংলাদেশের সাধারণ ফর্সা। বাপও বাংলাদেশের সাধারণ কালো; পুরুষের ক্ষেত্রে যেটাকে সবাই খুবই সাধারণ হিশাবে দ্যাখে। কালো হলেও ও যখন রাস্তা দিয়ে যায়, ওর দিকে অনেকেই তাকিয়ে থাকে। তাকানো আর তাকিয়ে থাকা দুই জিনিশ। বেশির ভাগ পুরুষ মেয়ে মানুষ দেখলেই তাকাবে। যদি তার কোনো অংশ দেখার মতো হয়, তাহলে যতক্ষণ সম্ভব তারা দেখবে। কিছু লোক আছে চোখ পড়ে যাওয়ার পর যদি চোখে আটকে যায়, দ্বিতীয়বার চোরা চোখে দেখবে। এই চোরা চোখের লোকদের দেখার মানে হলো তারা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। এদের চোখে ও আটকা পড়ে বেশি। এর কারণ

ও এখনো উদ্ঘাটন করতে পারেনি। নূহা এটা শোনার পর বলেছে, ‘নাবিলা, সুন্দর কী জিনিশ, তা তুই জানিস না। তুই অনেক সুন্দর একটা মেয়ে।’

‘নূহা, আমাকে আর কষ্ট দিস না।’ নাবিলা বলেছে।

কিন্তু নূহা আরো স্পষ্ট করে বলেছে, ‘তুই সত্যিই সুন্দর একটা মেয়ে। তোর চেহারার কাটিং খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় বিষয় হলো, তোর চেহারা একটা কমণীয়তা আছে। এটা অনেকেরই থাকে না। অনেক ফর্সা মেয়ের চেহারা দেখে মনে হবে ধুলা মাখা। এ রকম ধুলা মাখা ফ্যাকাশে চেহারা মোটেও ভালো লাগে না।’

তারপরও চেহারার রং নিয়ে ওর মধ্যে অনেক কষ্ট। ওকে বিয়ে দিতে ওর আন্টার অনেক কষ্ট হবে। বড়লোকের মেয়েদের বিয়ে দিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেই মেয়েগুলো নিজেরাই বিয়ে করে ফ্যালে। আর গরিবের মেয়েদের বিয়ে দিতে কষ্ট; কিন্তু তারা নিজেরা বিয়ে করতে পারে না। তাদের অনেক সমস্যা; অনেক বাধা।

এটা ঠিক যে, ওর চেহারা কোনো খুঁত নেই। আজ পর্যন্ত একটা ঘামাচিও ওঠেনি ওর চেহারা। তিব্বত স্নো ছাড়া আর কিছু ও মাখে না অথবা মাখার সাধ্য নেই।

আরেকটা আকর্ষণীয় দিক আছে ওর। সেটা হচ্ছে চুল। ওর মা নিজের মেয়ের চেয়ে মেয়ের চুলের যত্ন বেশি করেন। কোমর ছাড়িয়ে ওর চুল। প্রত্যেকটা চুল ঘন কালো আর জটমুক্ত। সপ্তাহে তিন দিন চুলে তেল দিয়ে দেন ওর মা। আধা ঘণ্টার কমে তেল দেয়া হয় না। নাবিলা ওর খালাতো বোন নাজমা আপার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলো এক দিন। নাজমা আপা বলেছিলেন, ‘মেয়েদের মাথা ঢাকা নিয়ে দুনিয়া জুড়ে এত তোলপাড় হচ্ছে কেন বলতে পারিস?’

নাবিলা তাকিয়ে ছিলো তার মুখের দিকে।

তিনি বলেছিলেন, ‘পশ্চিমা মেয়েরা আমাদের মতো এত লম্বা চুল রাখে না। কোরানে মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে কেন, এর জবাবে অনেককেই বলতে শুনবি সৌন্দর্যের কারণে। আমার কাছে ব্যাখ্যাটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মেয়েদের চুলে সৌন্দর্যের চেয়ে যে পাগল করা স্ত্রাণ বেশি থাকে, এটা জানিস? কবি-সাহিত্যিকরা যাকে বলে মাদকতা, ব্যাপারটা সে রকম। তোর দুলাভাইয়ের সাথেও এ নিয়ে কথা বলে যুক্তিটা আরো

পাকাপোক্ত মনে হয়েছে আমার কাছে। তোর দুলাভাই বলেছে, কাঁঠালচাঁপার যে রকম চাপা ঘ্রাণ থাকে, সে রকম চাপা ঘ্রাণ আছে মেয়েদের চুলে।’ কথাটা নাবিলা শুধু শুনেই গেছে। নাজমা আপা অনেক বই পড়েন। সব রকমের বইই পড়েন। আর প্রত্যেকটা বিষয় যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন। নাবিলার অত যুক্তি ভালো লাগে না। মাঝেমাঝে বান্ধবীদের কাছ থেকে এনে দু-একটা উপন্যাস ও পড়ে। একটা উপন্যাস শেষ করতে মোটামুটি মাসখানেক লাগে। ওর চুলের মধ্যে যদি সত্যিই মাদকতা থাকে, তাহলে ও যেন সেই মাদকতা দিয়ে ওর স্বামীকে কাছে টানতে পারে—এটুকুই ওর চিন্তা।

নাবিলাদের এখন ইংরেজি ক্লাশ হওয়ার কথা। দশ মিনিট হয়ে গেছে। এখনো ম্যাডামের কোনো খবর নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজ আর ক্লাশটা হবে না। ইংরেজি-বাংলা ক্লাশে সব গ্রুপের ছাত্রীরা থাকে বলে এই ক্লাশগুলো খুব আনন্দের হয়। আর যদি কোনো দিন ম্যাডাম এ রকম না আসেন, তাহলে তো কথাই নেই। সবচেয়ে বেশি কথা বলে বিবাহিত মেয়েরা। ওরা খুব নোংরা কথাও বলে। বেশির ভাগ মেয়ে ওদের কথা মজা নিয়ে শুনলেও দু-একজন সেগুলোতে মনোযোগ দেয় না। আবার ওদের কথায় তারা বাধাও দেয় না। বাধা দিতে গেলে আরো খারাপ কথা শুনতে হবে। যারা নোংরা কথায় মনোযোগ দেয় না তারা এই সময়টায় বই খুলে সে দিকে তাকিয়ে থাকে; না হয় নিজেরা অন্য কথা বলে। বিবাহিত মেয়েগুলো নিজেদেরকে একটু বড় বড় মনে করে। শাহানাজ তো বলেই, ‘আমার দেবরের বয়স তোদের বয়সের দেড় গুণ। সে আমাকে ভাবী আপনি করে বলে। আর তোরা?’ এই বড়ত্বের দোহাই দিয়ে ওরা অনেক কিছু বলতে আসে; অনেক পরামর্শও দিতে চায়। পড়ালেখা নিয়ে ওদের মোটেও মাথা ব্যথা নেই। ওদের কথা হলো, তোরা ফেল করলে না তোদের সমস্যা—বিয়ে হবে না। আমাদের চিন্তা কী রে?

সত্যিই ওদের চিন্তা থাকার কথা না। চিন্তা আছে নাবিলার। শুধু যে কোথায় ওর বিয়ে হবে না হবে সেই চিন্তা, তা না। পড়ালেখায় ওকে ভালো করতে হবে ওর আবার দিকে তাকিয়ে। শাহানাজ অবশ্য বলে ‘বেশির ভাগ মেয়েই এ রকম চিন্তা করে। বিয়ের পরে সব ভুলে যায়।’ কিন্তু নাবিলার মনে হয় না

ও এ রকম হবে।

নিরিবিলা থাকলে এই চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় বেশি করে। মাছের পোনা যে রকম পানিতে স্থির না থেকে শুধু ছোট্টাছুটি করতে থাকে, ওর মাথার মধ্যেও চিন্তাগুলো সে রকম করে। এ সময়টাতে ও কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। এখন সে রকম হচ্ছে। সমস্যা হলো এগুলো কাউকে বলা যায় না। বড়লোক মেয়েরা এগুলো শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেবে। ওরা বোঝে না এ সব কষ্ট। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতে থাকলো নাবিলা। বাইরে সারিবদ্ধ মেহগনি গাছ; তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের তেজ দেখা যাচ্ছে মধ্য জৈষ্ঠ্যের। এ রকম **তেজঃদীপ্ত** হতে চায় নাবিলা। ওকে পারতে হবে; পারতেই হবে।

নাঈমা রান ধরে নাড়া দিয়ে বললো, ‘কী রে, কী দেখছিস?’

সম্বিং ফিরে পেয়ে নাবিলা বললো, ‘হ্যাঁ? না না, কিছু না।’

জেসি বললো, ‘তোকে তো প্রায়ই দেখি এ রকম তাকিয়ে থাকতে। কবি হয়ে যাচ্ছিস না কি রে? তুই তো আবার কবি হবি না; তোকে বলতে হবে কবিনী। কবিনী নাবিলা।’

নাঈমা বললো, ‘কবি হলে তুই আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখিস রে। তাহলে কী হবে, জানিস? আমার ভাইয়া শুধু বলতে থাকে, বাংলাদেশের মেয়েদের কাজ যেন একটাই—রূপ চর্চা আর রূপ চর্চা। চ্যানেলে চ্যানেলে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। কবে যে এ দেশের মেয়েরা মেধা চর্চায় সময় দেবে!’

জেসি বললো, ‘এ জন্যই তো তাদের বাসায় আমার যেতে ইচ্ছা করে না। তোর ভাইয়ার সামনে পড়লে উনি চেহারাটা এমন করেন যেন আমরা খুবই বিরক্তিকর কোনো কিছু। মাঝেমাঝে বাজার থেকে যদি আব্বু ছোট মাছ আনেন, তখন আম্মুর চেহারা ও রকম হয়ে যায়। কারণ ছোট মাছ কুটতে অনেক কষ্ট। আম্মু ছোট মাছ সহ্যই করতে পারে না। তোর ভাইয়াও আমাদেরকে মনে হয় সহ্য করতে পারে না। আমরা তাদের বাসায় গিয়ে মনে হয় তোকে খারাপ হওয়ার ডোজ দিয়ে আসি—ওনার ভাবটা এ রকম থাকে।’

মিনু খুব কম কথা বলে। ও শোনে বেশি। চশমা পরে। চেহারার সাথে চশমাটা মানিয়ে গেছে। চেহারাটা ছোটখাটো গোলগাল, তাতে কিছুটা গোল আকৃতির লেন্স। মনে হয় ওর গালের সাথে খাপে খাপে মিলিয়ে বানানো।

জুতা বানানো যত সহজ, চশমা বানানো তত সহজ না। জুতা শুধু লম্বায় বড়-ছোট হলেই চলে। চশমা কেবল বড়-ছোট হলে হয় না। উপর-নিচ মিলতে হয়; কানের সাথে ডাঁট খাপ খেতে হয়; চেহারার আকৃতির সাথে চশমার আকৃতির মিল থাকতে হয়। মিনু যার সাথে কথা বলে চশমার ভিতর ওর চোখ দুটো তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। অন্যরা পঁচিশটা কথা বললে ও বলবে একটা। এতক্ষণ পর ও বললো, ‘তোর ভাইয়া কী করে রে?’ ‘পড়ালেখা করে।’

জেসি বললো, ‘ও, তোর ভাইয়া এখনো বালক ছেলে?’ নাজিমা কোনো জবাব দেয়ার আগেই মিনু আবার বললো, ‘জেসি, তুই মানুষকে সব সময় এমন নেগেটিভ চোখে দেখিস কেন?’

‘ও, তোর লেগে গেছে? নাজিমা, মিনু তোর হবু ভাবী না কি রে?’ মিনু অসহায় চোখে তাকালো নাবিলা আর নাজিমার দিকে। নাবিলা বললো, ‘জেসি আশোলেই বেশি কথা বলিস। এই জেসি, তুই চুপ থাক। এটুকু সময়ের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কথা তুই বলেছিস।’

‘নাজিমা বল বল। কবিনী নাবিলাকে নিয়ে আরো প্রশংসামূলক কথা বল। তোকে নিয়ে কেন, তোর ভাইকে নিয়েও যেন ও একটা কবিতা লেখে।’

‘লিখবে, সমস্যা কী? নাবিলার কবিতার বই বেরোলে ভাইয়াকে গিয়ে বলতে পারবো, ভাইয়া, এই যে দ্যাখো, বাংলাদেশের মেয়েরা মেধা চর্চাও করে।’ নাবিলা মনে মনে ভাবে, সত্যিই যদি সেটা হতো! যদি কবিতা লিখে কাউকে মুগ্ধ করা যেতো! কিন্তু নাবিলা কোনো কবিতা লিখতে পারে না। ক্লাশের বইয়ের বাইরে কোনো কবিতা ও পড়েওনি।

আড্ডা চালিয়ে নেয়ার জন্য জেসিই আবার শুরু করে, ‘গতকাল তেরে লিয়ে সিরিয়ালটা দেখেছিস? দেবীর ড্রেসটা দারুণ লেগেছে না? চাঁদনীচকে খোঁজ লাগাতে হবে আগামী সপ্তায়—ড্রেসটা এসেছে কি না।’

শিহাবকে জরুরী ভিত্তিতে বাসা থেকে ডাকা হয়েছে। ওর মা ফোন করেছিলেন।

ও জানতে চাইলো, ‘ঘটনা কী?’

তিনি শুধু বললেন, ‘তুই আয়। না এলে বুঝানো যাবে না।’

জরুরী বিষয় হওয়ায় শিহাব মনোয়ারের সাইকেল নিয়ে চলে এসেছে। ওর সাইকেলটা নিয়ে গেছে অন্য কেউ। মেসে সাইকেল আর জুতা যার যখন যেটা মনে চায় নিয়ে চলে যায়। খুঁটিনাটি আরো কিছু একজন আরেকজনেরটা ব্যবহার করে। তবে সেগুলোর বেলায় নিয়ম হলো বলে নিতে হবে। যেমন কারো টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেলে সে যদি অন্য কারো টুথপেস্ট ব্যবহার করে, তাহলে যার টুথপেস্ট, সে তখন না থাকলে তার টেবিলে একটা চিরকুট লিখে রেখে আসতে হবে, ‘আমার টুথপেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় তোর পেস্ট ব্যবহার করলাম।’ সাবান, বডি স্প্রে, মোবাইল, খাতা—এ সবার বেলায় এ নিয়ম। কেউ যদি কলেজে যাওয়ার সময় নিজের খাতা খুঁজে না পায় তাহলে সে দিন অন্য কারো ক্লাশ না থাকলে তার অনুপস্থিতিতেও তার খাতা বা ডায়রি নিয়ে যেতে পারবে। যে পৃষ্ঠাগুলোতে সে লিখবে সেগুলো ছেঁড়া যাবে না; ফটোকপি করে নিতে হবে। আর চাকু, আয়না-চিরুনি, ব্যাট-বল—এগুলোর জন্য কিছু বলার দরকার নেই। সাইকেল-জুতাও একই কাতারে। তবে জামা-কাপড়ের বেলায় নিয়মটা একটু কড়া। অন্যের জামা-কাপড় পরলে সেটা জানাতে তো হবেই, মেসে আসার পর তা ধুয়ে ইস্তিরি করে দিতে হবে।

শিহাব ঘরে ঢুকে দেখলো শামীম বসা। শামীম ওর চাচাতো ভাই। বছ বছর ধরে ইটালিতে আছে। কিন্তু তার সাথে তো ওদের কোনো যোগাযোগ নেই। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কী মনে করে এসেছে কে জানে?

‘আসসালামু আলাইকুম শামীম ভাইয়া।’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম।’ টেনে টেনে বললো শামীম, ‘কেমন আছো ভাই? কত বছর পর দেখা! আসো, একটু কোলাকুলি করি।’

‘কখন এলেন?’

‘এই তো ঘণ্টাখানেক হবে।’

‘বিদেশ থেকে ফিরলেন কবে?’

‘পরশু।’

‘কই, আমরা তো কিছুই জানি না।’ মনে মনে বললো, আমরা অবশ্য কখনোই কিছু জানি না।

‘তাড়াছড়ার মধ্যে আসা হয়েছে তো!’

‘ভাবী আসেননি?’

‘না।’ না বলার সময় দেখা গেলো মাথাটা নিচু করলো। কোনো কিছু হয়েছে তাহলে?

এরই মধ্যে ওর মা ডাকলেন, ‘শিহাব, ভিতরে আয় তো বাবা।’

শিহাব ভিতরে এলো।

ওর মা চাপা গলায় বললেন, ‘তোর আব্বা সেই কখন আসবেন! তুই একটু বাজারে যা কষ্ট করে। এখন তো সাড়ে তিনটা বাজে। কোনো মাছ পাবি না। একটা মুরগী আর পোলাউর চাল নিয়ে আয়।’

‘থাকবে কি থাকবে না সেটা আগে জিজ্ঞেস না করেই বাজার করার দরকার আছে?’

‘তুই বেশি বুঝিস না তো ছেলে। বাড়ি থেকে এসেছে কি এখনি চলে যাওয়ার জন্য?’

‘দ্যাখো, কোন মতলবে এসেছে। আব্বার নিজের কেনা যেটুকু জমি আছে সেটুকুও হাত করার জন্য কোনো ফন্দি নিয়ে এসেছে কি না!’

‘তাদের শুধু বাড়তি কথা। ফন্দি-টন্দি পরে দেখা যাবে। তোকে যা বললাম তুই তাই কর।’

বের হওয়ার সময় ও বললো, ‘শামীম ভাইয়া, বাইরে আমার একটু জরুরী কাজ আছে। দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে। আপনি আরাম করে বসেন। আর বেশি ক্লান্ত হলে ঘুমাতেও পারেন।’

‘আচ্ছা, তুমি আসো। সমস্যা নেই।’

ফিরে এসে দেখলো ওর শামীম ভাইয়া যেভাবে পা বুলিয়ে বসা ছিলো সেভাবেই আছে। ও বাজার ভিতরে রেখে এসে চেয়ার টেনে চাচাতো ভাইয়ের মুখোমুখি বসলো। শামীম বসেছে খাটে।

‘তারপর কী অবস্থা বলো দেখি। পড়ালেখা শেষ?’

‘এই তো, এ বছরই শেষ হবে।’

‘তারপর কী করবা?’

‘কী আর করবো? চাকরি খুঁজবো। জমানো টাকা থাকলে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতাম।’

‘বাংলাদেশে আর কী ব্যবসা করবা? এই দেশে কি ব্যবসা আছে?’

‘আছে না? ব্যবসা তো এই দেশেই। এই দেশে বড় ব্যবসা করতে কোনো পুঁজি লাগে না। লাগে শুধু চিকন বুদ্ধি।’

শামীম কি কথাটা বুঝতে পেরেছে? শামীমের বাপ, মানে শিহাবের চাচা হলো ধান্দাবাজিতে ওস্তাদ। ছেলেরাও বাপের রক্ত পেয়েছে। ওর দাদার জমি যা ছিলো, তার বেশির ভাগই ওর চাচা নিজের কজায় নিয়ে গেছেন। ওর দাদাকে এসে তিনি বলতেন, ‘বাজান, এই জমিতে তো অনেক ভেজাল। বেচে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়।’ ওর দাদা ছেলের বুদ্ধিতে জমি বিক্রি করে দিতেন। যার কাছে বিক্রি করতেন তার কাছ থেকে আবার ওর চাচা কিনে নিতেন। সেই লোকের সাথে আগেই ওর চাচা একটা চুক্তি করে নিতেন। যেহেতু ভেজালের জমি, এমনিতে যা দাম আছে তার চেয়ে দুই-তিন ভাগ কম দামে জমি বিক্রি করা হতো। যার কাছে বিক্রি করা হতো তাকে মূলত ওর চাচা ভাড়া করে নিয়ে আসতেন। জমি কেনার টাকা ওর চাচাই সেই লোকের হাত দিয়ে দেয়াতেন। ওর দাদা টাকা নেয়ার সাথে সাথে আবার বলতেন, ‘আমার কাছে রাখার কী দরকার? তুমিই রাখো। তোমার সংসারেই তো খাই। লাগলে আমি না হয় ছোট বৌয়ের কাছ থেকে চেয়ে নেবো।’

এভাবে কোনো জমিতে ভেজাল, কোনো জমি বর্গা নেয়ার লোক পাওয়া যায় না, কোনো জমিতে কখনো ভালো ফসল হবে না—এ সব যুক্তি খাড়া করে ওর চাচা নিজের নামে কয়েক একর জমি করে নিয়েছেন। ওর আব্বার ব্যাপারে গ্রামের লোকজনের কাছে তিনি বলে বেড়ান, ‘মিয়া ভাই তো জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। উনি আর এ দিকে ফিরবেন না। বাড়ির ভিটায় যেটুকু অংশ আছে সেটুকু রেখেছেন বাজানের স্মৃতি হিসাবে।’

সেই চাচার বড় ছেলে ওর শামীম ভাই। পড়ালেখা ক্লাশ নাইন পর্যন্ত। তারপর ইটালি চলে গেছে। সেখানে গিয়ে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা দিয়েছে, এটুকুই ওরা জানে। কারণ চাচা, চাচী বা চাচাতো ভাই-বোনেরা এ বিষয় নিয়ে কখনোই কিছু বলতে আগ্রহ দেখায় না; ওরাও সেধে জিজ্ঞেস করে না। শামীম ওর ছোট চাচার ছেলে হলেও বয়সে ওর চেয়ে বড়। শিহাবের জন্ম হয় ওর মা-আব্বার বিয়ের অনেক পরে। ওর যখন জন্ম হয়, তখন শামীমের

বয়স দশ-এগারো বছর।

শামীম জানালো, ‘আরে, আমি আসার পর থেকে বসেই আছি। নাবিলা আমার সামনে আসে না। ছোট বাচ্চাদের মতো মনে হয় ভয় পেয়েছে।’

‘আপনাকে মনে হয় ও দেখেইনি। আপনি ইটালি যাওয়ার পরে ওর জন্ম হয়েছে না?’

‘হ্যাঁ, তাই মনে হয়। আমি যাওয়ার কয়েক মাস পরেই ওর জন্ম হয়।’

‘তাহলে ও আপনাকে এই প্রথম দেখলো। আর আপনি তো আমাদের সাথে ফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে যোগাযোগও রাখেননি যে, আপনার কণ্ঠস্বর বা চেহারা ও চিনবে। আচ্ছা যাক, ওখানে আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?’

‘ভালোই।’

‘ভাবীর কথা জিজ্ঞেস করলাম; তেমন কিছু বললেন না তো।’

‘আচ্ছা, পরে বলবো। চাচীআম্মা কই?’

শিহাব ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, ‘রান্না ঘরে গেলেন কি না।’

‘চাচা কখন ফিরবেন?’

‘সাড়ে সাতটা কি আটটায়। সাড়ে আটটা বা নয়টাও বাজতে পারে। জ্যামের উপরে নির্ভর করে সব কিছু। মন্ত্রীদের গাড়ি যদি আজ ফার্মগেট বা বাংলামটর হয়ে না যায় তাহলে আকা তাড়াতাড়ি আসবেন। আর ওনারা গেলে দেরি হবে। মন্ত্রীদের গাড়ি গেলে রাস্তা খালি হয়ে যায়; তবে সেই রাস্তা পার হয়ে আসতে অন্য মানুষদের দ্বিগুণ সময় লাগে।’

‘আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বের হই।’

‘কোথায় যাবেন? এখন তো বাইরে রোদ। রোদ কমলে আসরের পরে বের হবেন।’

‘এই রোদে কী হবে? ভাদ্র মাস তো আর নেই। আশ্বিনও মনে হয় এ সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে।’

‘কিন্তু যাবেন কোথায়? এ এলাকায় তো আর আপনার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই।’

‘চলো, তোমার সাথেই যাই।’

‘আচ্ছা, এক মিনিট বসেন। মাকে একটু বলে আসি।’

শিহাব বের হয়ে রান্না ঘরের বাইরে থেকে ওর মাকে ডাক দিয়ে বললো, ‘মা, শামীম ভাই একটু বের হতে চাচ্ছেন। আমি ওনার সাথে যাচ্ছি।’

‘তাড়াতাড়ি ফিরিস। আচ্ছা শোন, রাতেও থাকবে না কি? তাহলে বিপদে পড়তে হবে। তুই তো বলেছিলি, থাকবে না।’

‘থাকলে ঘুমাবে কোথায়? আমি বলবো, চলেন আমার সাথে; মেসে যাই।’

‘আরে না। ও কখনো আমাদের বাসায় আসেনি।’

‘তাহলে কি তোমাকে আর নাবিলাকে রেখে আব্বাকে নিয়ে মেসে যাবো?’

‘কী সব উল্টাপাল্টা কথা বলছিস? নাবিলা না হয় বাড়িওয়ালীদের ঘরে চলে যাবে।’

‘কেন, ওনার জন্য নাবিলা আরেক বাড়িতে যাবে কেন? তুমি আর নাবিলা ভিতরে ঘুমাবা; আব্বা সামনের রুমে খাটে ঘুমাবেন। আর ওনাকে নিচে ঘুমানোর জন্য বিছানা পেতে দেয়া হবে।’

‘এই ছেলে, তুই একটু বেশি কথাই বলিস। যা তুই, যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস।’

গেট থেকে বের হতে হতে শামীম বললো, ‘শিহাব, আমার এক জোড়া জুতা কিনতে হবে। এই জুতা কিনে ঢাকা রওনা দিয়েছি। কিন্তু আমার পায়ের মনে হয় চার দিক থেকে ফোস্কা পড়ে চামড়া উঠে গেছে। এই জোড়া পরে বরিশাল যেতে অনেক কষ্ট হবে।’

শিহাব ততক্ষণে ইশারায় রিকশা দাঁড় করিয়েছে। শামীম তার পায়ের দিকে আঙ্গুল তাক করলেও শিহাব সে দিকে একবার চোখ ফেলে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে। পুরুষ মানুষের পায়ে ফোস্কা পড়েছে, এটা দেখার কোনো বিষয় না। অনেক সময় জুতা পায়ের মাপমতো হওয়ার পরও পায়ে ফোস্কা পড়ে। দু দিন পরার পর আবার ঠিক হয়ে যায়।

রিকশাওয়ালাকে শিহাব বললো, ‘হাউজ বিল্ডিং।’

রিকশাওয়ালা কিছু বললো না; তবে চোখ ঘুরিয়ে দুইবার তাকালো শামীমের দিকে। এই ওজন টানতে পারবে কি না সেটাই হয়তো সে ভাবছে। শামীমের ওজন নব্বইর উপরে হবে। বৃষ্টিতে যে রাস্তা ভেঙে গেছে, তা এখনো ঠিক হয়নি। রিকশাওয়ালার সত্যিই কষ্ট হবে।

শিহাব বললো, ‘আপনি ঘুরে রেল ক্রসিং পার হয়ে যান। এ দিক থেকে গেলে রাস্তা ভালো আছে। ঘুরপথ হলেও তার কষ্ট কম হবে।’

শামীম তার হাত রেখেছে শিহাবের রানের উপরে। ওর মেজাজ মারাত্মক গরম হচ্ছে। হাতটা সরিয়ে দিতে পারছে না; বলতেও পারছে না সরিয়ে

নিতে। খানিক চিন্তা করে বললো, ‘শামীম ভাই, আমার একটু কাতুকুতু রোগ আছে। আপনি হাত না সরালে আমি ঠিক হয়ে বসতে পারবো না।’

শামীম হাত সরিয়ে নিলো। সরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকালো। শিহাবও চুপ করে রইলো। শিহাবের ভাবনা এখনো শেষ হয়নি। একে দেখার পর থেকেই ও ভাবছে। কোন মতলবে যে এই লোক এসেছে, সেটাই এখনো ও বের করতে পারেনি। জমি তো সব খাওয়া শেষ। তাহলে? ওর জন্য কোনো ভিশার লোভ দেখিয়ে টাকা নিতে এসেছে? জিজ্ঞেস করবে না কি, ‘ভাই আপনি কোন মতলবে এসেছেন বলেন তো?’ তাহলে একটা সুবিধা হতে পারে। এই লোক আর ওদের বাসায় যাবে না। যেভাবেই হোক, ওকে জানতে হবে।

‘শামীম ভাই ঢাকায় আছেন কত দিন?’

‘না, আজ রাতেই ফিরবো।’

‘এত তাড়াহুড়া করে...। কী বিষয়?’

‘আছে, বাড়ির কিছু বিষয়াদি আছে। চাচার সাথে কথা বলতে হবে।’

‘বাড়ির আর কী বিষয়? আমাদের তো আর কোনো এজমালি জমি নেই।’

‘কী বলো তুমি এজমালি জমি নেই? বাড়িতে তোমাদের ঘর উঠানোর জন্য আট শতাংশ জায়গা আছে না? এটা এজমালি জমি না?’

‘এখন কি এটাতেও আপনারা ঘর উঠাবেন?’

‘শিহাব, আব্বা কী করেছেন না করেছেন সেটা নিয়ে আমরা ভাইয়েরা না ভাবি।’

‘আব্বাও তো চাচার ভাই। এক মায়ের পেটের ভাই।’

‘আচ্ছা, এগুলো নিয়ে না হয় আমরা পরে কথা বলবো। আমরা মনে হয় চলে এসেছি। রাস্তার ও পারে যেতে হবে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

শিহাব ভেবেছিলো ওকেই রিকশা ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু নামার আগেই শামীম মানিব্যাগ থেকে একশো টাকার নোট বের করে রিকশাওয়ালার সামনে মেলে ধরলো। শিহাবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কত ভাড়া?’

‘ভাড়া তো তিরিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ—এ রকম। আমরা দুইজন এসেছি, সে জন্য একটু বেশি দিতে হবে মনে হয়। এই মামা, আপনি পঞ্চাশ টাকা

ফেরত দেন তো।’

আশোলে চল্লিশ টাকাতেই রিকশাওয়ালা খুশি ছিলো। শিহাব ভাবলো, এই ঠগের কাছ থেকে যদি আরো দশটা টাকা সে বেশি নিতে পারে, খারাপ কীসে?

‘ভাই কি চায়না মার্কেট যাবেন না দেশী মার্কেট?’

‘চায়না মার্কেট মানে?’

‘মানে এখানে একটা মার্কেট আছে, চায়নার সব কিছু পাওয়া যায়।’

‘না না। দেশী মার্কেটেই চলো। কী যে ভুল করলাম! ইটালি হলো জুতার দেশ। আমার উচিত ছিলো ওখান থেকে কয়েক জোড়া জুতা নিয়ে আসা। কিন্তু সমস্যা হলো জুতার জন্য অনেক জায়গা লাগে। দুই জোড়া জুতা একটা ছোট ট্রলি ভরে যায়।’

‘এক কাজ করতে পারতেন ভাই। জুতার ভিতরে অন্য জিনিশ ঢুকিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন।’

মার্কেটে ঢুকে দেখা গেলো শামীম শুধু তার জুতা কিনছে না; মেয়েদের জুতাও দেখছে। শিহাব জিজ্ঞেস করলো, ‘ভাবীরও কি পায়ে সমস্যা?’

‘আরে না।’

‘তাহলে মেয়েদের জুতা কী জন্য?’

‘কেন, তোমার ভাবী ছাড়া কি আর কেউ জুতা পরে না?’

জুতার পরে শাড়ি, থ্রি পিসও কেনা হলো। শিহাবের জন্যও অফার এলো, ‘তুমি কিছু নেবা না কি?’

‘না ভাই। আমার জামা-কাপড় এই মার্কেটে পাওয়া যায় না।’

‘কেন? তোমার তো মিডিয়াম বডি। তোমার জামা-কাপড় এই মার্কেটে কেন পাওয়া যাবে না?’

‘ভাই, আপনার আর কিছু কেনার থাকলে কিনে ফেলেন। আমাকে আপনি আর এ সব কথা বলবেন না।’

সব শেষে মিষ্টিও কেনা হলো।

বাসায় ফেরার পর সব কিছুই ওর মায়ের হাতে তুলে দেয়া হলো। শিহাব কপাল কুঁচকালো। ভিতরে গিয়ে বললো, ‘মা, সব ঘরের এক কোনায় রেখে

দাও তো। আব্বা আসুক; দেখি কী বিষয় নিয়ে আলাপ করে তার সাথে।’
 ‘তোর আব্বা তো মনে হয় এখনি চলে আসবে। তুই এক কাজ কর। ওকে
 তোর লুঙ্গি দে। গোসল করতে চাইলে গোসল করে আসুক।’
 শিহাব ওর লুঙ্গি নিয়ে শামীমের হাতে তুলে দিয়ে বললো, ‘ভাই, গোসল
 করবেন?’

‘করতে পারলে খারাপ হয় না।’

‘তাহলে আমি গামছা এনে দিচ্ছি। আমাদের কিন্তু চার পরিবারের এক
 বাথরুম। যাওয়ার আগে কাশি দিয়ে যেতে হবে।’

‘আরে, বাড়িতেও তো এক কলেই সবাই কাজ করে।’

গামছা আনতে আনতে শিহাব বললো, ‘বাড়িতে তো নিজেরা নিজেরা।
 আপনি এই ডান দিকে যান।’

শামীমকে বের করে দিয়ে এবার তিনজন একসাথে বসলো। শিহাব বললো,
 ‘নাবিলা বল তো, কী ধাক্কায় এ এসেছে আমাদের বাসায়?’

‘আমি কি আর ওনাদের কোনো ধাক্কা দেখেছি যে বলবো? আমার মনে হয়
 ঘটনা কোনো কিছুই না। ঢাকায় কোনো ফ্লাট-ট্রাট কিনবে; সে জন্য এসেছে।
 মাঝখান দিয়ে আমাদের বাসায় একটু রেস্ট নিয়ে নিলো।’

‘ঢাকায় ফ্লাট কিনবে কেন?’

‘আহ, ওনার বৌ কি গ্রামে গিয়ে থাকবে বলে তুমি মনে করো? ধরো উনি
 তিন মাসের ছুটিতে এসেছেন। এখন তিন মাসের জন্য একটা বাসা ভাড়া
 করতে হবে। তার চেয়ে একটা ফ্লাট থাকলে খারাপ কী? অন্য সময় ভাড়া
 চলবে; উনি যখন বিদেশ থেকে ফিরবেন, তার দু-তিন মাস আগে
 ভাড়াটিয়াকে বলে দেয়া হবে বাসা ছেড়ে দেয়ার জন্য।’

‘হুম, খারাপ বলিসনি। কিন্তু আমাদের বাসায় শুধু সময় কাটানোর জন্য এলে
 এত কেনাকাটা করলো কেন?’

‘সেটাও একটা প্রশ্ন। মনে হয়...।’

এরই মধ্যে নিজামুদ্দিন চলে এলেন। সালেহা বললেন, ‘আপনি বসেন।
 বাথরুম এখন খালি নেই।’

‘কী, তোমরা কী নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে? শিহাবের কী অবস্থা? তোমাকে
 তো আমি দেখিই না। শুক্রবার সারা দিন বাসায় থাকি। অপেক্ষা করি তুমি
 আসবা আসবা। কিন্তু তোমার দেখা পাই না।’ শার্ট খুলতে খুলতে তিনি

বললেন।

‘শুধুবারেই আমার কাজের চাপ একটু বেশি থাকে আব্বা।’

‘এ বয়সেই এত চাপ নিয়ে শরীর খারাপ করলে কীভাবে হবে? তোমার চেহারা কী হয়েছে দেখেছো?’

শিহাব কোনো জবাব দিলো না।

‘তুমি টিউশনি বা চাকরি যে কোনো একটা ছাড়ো। আমি তো আর মারা যাইনি। আল্লাহ সুস্থ রেখেছেন, কাজ করে যাচ্ছি। এত দিন চলেছি না? না হয় তোমার দেয়া টাকায় আমরা মাসে চার-পাঁচ দিন দামী মাছ খেতে পারছি—এই তো? তুমি ইনশাআল্লাহ লেখাপড়া শেষ করে যখন পুরোদমে চাকরি করবা, তখন না হয় আমরা প্রত্যেক দিন ভালো খাবো।’

নাবিলা দেখলো ওর আব্বা কথা বলেই যাচ্ছেন। এটা বন্ধ করার জন্য ও বললো, ‘আব্বা, শামীম ভাই এসেছে আমাদের বাসায়।’

‘শামীম? ও বিদেশ থেকে এসেছে?’

‘হ্যাঁ, তিন দিন আগে না কি ফিরেছে।’

‘ভালো।’

‘আপনার সাথে না কি জরুরী আলাপ আছে। সে জন্য অপেক্ষা করছে।’

‘আচ্ছা।’

সামনের রুমে কাশির আওয়াজ শোনা গেলো। নিজামুদ্দিন সেখানে গেলেন।

শামীম দেখার আগেই সালাম দিয়ে জানতে চাইলেন, ‘কেমন আছো?’

‘হ্যাঁ, ভালো আছি চাচা।’

‘আচ্ছা, বসো। আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।’

তিনি বাথরুম থেকে ফিরতে ফিরতে মায়ের কথায় শিহাব সামনের রুমে খাবার সাজিয়ে ফেললো।

শিহাবদের ছয়টার বেশি চীনা মাটির প্লেট নেই। এমনিতে ওরা মেলামাইনের প্লেটে খায়। উঠিয়ে রাখা গ্লাসও ছয়টা ছিলো। দুটো ভাঙার পর এখন চারটা আছে। চায়ের কাপও আছে চারটা; পিরিচ পাঁচটা। এর আগের বাসায় থাকতে বুঝার যখন একেবারে গ্রামের বাড়িতে চলে যায়, তখন কিছু জিনিশ বিক্রি করে দিয়ে যায়। সেখান থেকে ওর মা তাদের পুরনো শোকেসটা কিনে রেখেছিলেন এক হাজার টাকায়। সেই শোকেসের মাঝখানের তাকে এই জিনিশগুলো থাকে। সেগুলোর পাশে নাবিলার কিছু চুড়ি, কসমেটিকস, ক্লিপ

আছে। নিচের তাকে আছে নাবিলার আর ওর মায়ের বেড়াতে যাওয়ার কাপড়-চোপড়। উপরের তাক দুই ভাগ করা। এক ভাগে কোরান-হাদিস, আরেক ভাগে শিহাবের কিছু যন্ত্রপাতি আছে। ঘরের টুকটাকি কাজ করার জন্য এগুলো লাগে। মিস্তিরি ডাকতে গেলেই অন্তত দুইশো টাকা দিতে হয়। তিনটা প্লেট ওর মা আর বোন ধুয়ে রেখেছেন। সেগুলো ও নিয়ে এলো। তিনটা গ্লাশও নিয়ে এলো।

ওর আব্বা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, ‘আব্বা, বসে পড়েন।’

ওর মা আর বোনের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিলো করেছে। ডিমের কোর্মা, মুরগীর ঝাল গোস্ত, তেলাপিয়া মাছ, ফিরনি। মাছটা মনে হয় পাশের কোনো বাড়িতে ফ্রিজে রাখা ছিলো। বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছগুলোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত তেলাপিয়াই টিকে আছে ভালোভাবে। তেলাপিয়া ধনী-গরিব সব লোকেরা খায়।

শামীম বললো, ‘চাচীআম্মা আর নাবিলা তো অনেক কষ্ট করেছে।’

ভিতর থেকে সালেহা বললেন, ‘গ্যামের চুলায় কী আর কষ্ট? চড়িয়ে দিলেই হয়ে যায়।’

শিহাব বললো, ‘আরে খান। যত দিন দেশে আছেন, ভালো করে খাবেন। ইটালি মানে তো পিজা আর পাস্তা।’

‘না, আমরাও ভাত রান্না করেই খাই।’

‘খেলেও দেশের স্বাদ পাবেন না। দেশী পিঁয়াজ পাবেন না ওখানে; এ রকম সালাদ পাবেন না। অনেক কিছুই পাবেন না।’

‘তা ঠিক।’

নিচের দিকে ঝুঁকে খেতে খেতে শামীম বললো, ‘চাচা, আশোলে তো আমরা আপনার সাথে যে সব করেছি, তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এখন যদি আপনি ও সব ভুলে যান, তাহলে আমরা বেঁচে যাই।’

‘কেন, তোমাদেরকে কি আমি কখনো কিছু বলেছি? তৌফিককে বলেছি?’

‘না, তা বলেননি। যাই হোক, আব্বাও আমাকে বলেছেন, আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুন্দর করা দরকার।’

‘অসুন্দরটা কোথায়?’

‘চাচা, আমি ইটালি গেছি, আপনারা হয়তো এটুকুই জানেন। তারপরে কী হয়েছে না হয়েছে তা আপনাদেরকে আমরা বলিনি, জানেনও না। আমি তো

বিয়ে করলাম বছর তিনেক হলো।’

‘হ্যাঁ, তোমার আঝা আমাকে ফোন করে বলেছিলো, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি যেন সময়-সুযোগ করে যাই, দোয়ায় অংশ নিই। কিন্তু আমি সময় করতে পারিনি। বাড়িতে গেলে অন্ততপক্ষে তিন দিনের ছুটি নিতে হয়। কিন্তু তখন আমার টেবিলের কাজ চালানোর মতো লোক আর থাকে না বলে আমি ছুটি নিতে পারি না। তাই বলে তোমার জন্য দোয়া না করে থাকিনি।’

‘তো, লিজা ভালোই ছিলো। আঝা দেখে-শুনে বিয়ে করিয়েছেন। কিন্তু আমি ভুলটা করেছি ওকে ইটালিতে নিয়ে। প্রথম দুই বছর কোনো সমস্যা হয়নি। দুই বছর যাওয়ার পর সে ঐ দেশীদের মতো হওয়ার চেষ্টা করা শুরু করলো।’

‘ঐ দেশে থাকবে, ঐ দেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে না?’

‘না, মানে...।’

‘আচ্ছা, বলো। তারপর?’

‘কয়েক মাস আগে থেকে অবস্থা একেবারে খারাপ হতে শুরু করেছে। সে নাইট ক্লাবে যাবে; যা খুশি তাই করবে। শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছামতো ওকে ছেড়ে দিলাম।’

‘মানে ডিভোর্স?’

‘হ্যাঁ। নিজের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে।’

‘মানে ঐ দেশী কাউকে বিয়ে করেছে, তাই তো?’

শামীম এ কথার জবাব না দিয়ে বললো, ‘আমি মা-আঝাকে বলেছি, আমারও এখন আর সংসারের প্রতি কোনো টান নেই। এ নিয়ে যেন তারা কোনো কথা না বলেন। কিন্তু মা তো কেঁদেকেটে শেষ। এবার উনি দেখে শুনে ভদ্র ঘরের মেয়ে আনবেন; বিদেশ আর যেতে দেবেন না।’

শিহাব বললো, ‘তাহলে আর বিয়ে করার কী দরকার? বিয়ে করে বৌ থাকবে এক জায়গায় আর...।’ এটুকু বলে নিজেই আবার চুপ করে গেলো। ওর আঝা বসা। ওনার সামনে কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে না।

নিজামুদ্দিন বললেন, ‘এখন তোমার দরকার সংসারী মেয়ে। সবচেয়ে ভালো হয় ডিভোর্সী বা স্বামী কোনো কারণে মারা গেছে এমন মেয়ে পেলে। ডিভোর্সী বলতে ধরো যে মেয়েকে বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসতে হয়েছে। এ ধরনের মেয়েরা খুব ভালো হয়। এখন কি তুমি এসেছো আমার

কাছে এ রকম মেয়ের কোনো খোঁজ আছে কি না তা জানার জন্য?’

শামীম হাড্ডি চুষতে চুষতে বললো, ‘না, মানে আমি তো বললামই এ বিষয়ে আমার সামান্যতম আগ্রহও নেই। মা মনে হয় আপনার সাথে, চাচীআম্মার সাথে এ নিয়ে কথা বলবেন। খাওয়া শেষ করে আমি কল দিয়ে আপনাদেরকে ধরিয়ে দিচ্ছি।’

ফোন ধরার সাথে সাথে ও পাশ থেকে শামীমের মা কেঁদে কেঁদে বললো, ‘মেয়া ভাই, মোর পোলাডারে এক্কালা শ্যাব কইর্রা দেছে। কতগুলো টাহা নিয়া ছেমড়ি ভাগজে!’

‘এখন আর কেঁদে কী হবে? তোমার ছেলে বেঁচে থাকলে আরো টাকা কামাতে পারবে। তোমার ছেলের তো আর অন্য কোনো ক্ষতি সে করেনি।’

‘মেয়া ভাই, আক্ষে বড়। বড়রা সব সময় ছোডোগো মাফ কইর্রা দেয়। এত দিন যা ঐছে না ঐছে আক্ষে সব মাফ কইর্রা দেবেন। এই আবদার আক্ষের ধারে। আরো একটা আবদার আছে। আক্ষে অনুমতি দেলে কমু।’

‘তুমি তো বলেই যাচ্ছে। আবার অনুমতির কী আছে?’

‘মেয়া ভাই, নাবিলারে মুই চাই শামীমের লইগ্গা।’

নিজামুদ্দিনের চেহারা বদলে গেলো। তার গলার স্বর চড়ে গেলো। তিনি বললেন, ‘আর কোনো আবদার আছে তোমার?’ চিৎকারের মতো শোনা গেলো তার কথা।

‘ইটু ভাবীরে দেন।’

সালেহাকে দেয়া হলো। সালেহার কাছেও তিনি একই কথা বললেন। সালেহা শুধু শুনে গেলেন। অবশ্য শুনছে সবাই। মোবাইলে লাউড স্পিকার চালু না থাকলেও ভলিউম বাড়ানো। তাতে আশেপাশের লোকেরাও ও প্রান্তের কথা পুরো শুনতে পায়।

সালেহা বললেন, ‘আচ্ছা নাজমা, আমি তোমার মিয়া ভাইর সাথে আগে আলাপ করি। ঠিক আছে?’

নিজামুদ্দিন শামীমের হাতে ফোন তুলে দিয়ে ওর হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন, ‘বাবা, তোমার আব্বা কৌশল করে আমার ওয়ারিশী সম্পত্তি নিজের করে নিয়েছে। আমার এতে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমার বড় সম্পদ তোমার এই ভাই-বোন। এদের চিন্তা আমাকেই করতে দাও। তোমাদের

সাথে আমার কোনো দিন কোনো মুখ কালাকালি হয়নি। আমি চাইলে মামলা করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। লোকেরা তখন বলাবলি করতো, তবিরুল চাচার ছেলেরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে মামলা লাগিয়েছে। আমি চাই না আমাদেরকে খারাপ বলতে গিয়ে কেউ বাজানকে খারাপ বলুক। আবারো বলি, তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক একেবারে স্বাভাবিক আছে। বাজান মারা গেছেন, মা মারা গেছেন। তবুও আমি বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করিনি। তোমাদের সাথে বছরে অন্তত একবার উঠাবসা হয়। সেটাও যাতে বন্ধ না হয়। তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার মালামালগুলো নিয়ে চলে যাও। এ বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা বোলো না।’

এরপর আর শামীমের এখানে থাকা চলে না। সে বেরিয়ে গেলো। চাচা-চাচীকে কী বলবে সেটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো। তারপর বললো, ‘তাহলে আমি গেলাম চাচাজান। চাচীআম্মা, গেলাম। দোয়া করবেন।’

সালেহা শুধু বললেন, ‘আচ্ছা।’

শিহাব পিছনে পিছনে তার কেনা মালামালগুলো নিয়ে এলো। রিকশার জন্য দাঁড়ানো আছে শামীম। শিহাব আরেক দিকে তাকিয়ে আছে। ‘এগুলো আমি নেবো না’—এ কথা শামীম বলতে পারছে না? না কি খুশি হয়েছে ভিতরে ভিতরে? যেখান থেকে কোনো ফায়দা আসবে না সেখানে টাকা খরচ করে লাভ কী?

রিকশা পাওয়ার পর শিহাব মালামালগুলো উঠিয়ে দিয়ে বললো, ‘বাড়িতে পৌঁছার পরে ফোন দিয়ে জানাবেন।’

ঘরে এসে শিহাব শুরু করলো চেষ্টামেচি। ওর বেশি রাগ ওর আব্বার উপরে। ‘আব্বা, আপনি ওনার হাত ধরে এভাবে বলতে গেলেন কেন? ওনার মুখের উপরে উচিত ছিলো ঝাঁটা মারা। কত্ত বড় সাহস! ওনাদের কাছে কি আমরা কোনো দিক দিয়ে ঠেকা যে, ওনাদের সাথে এভাবে অনুনয় করে কথা বলতে হবে? আপনি বিদায় দিয়েছেন দেখে আমি কিছু বললাম না। না হলে কিন্তু আমি মহল্লার পোলাপান দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে দিতাম।’

ছেলের এতগুলো কথায় নিজামুদ্দিন চুপ করে রইলেন। শিহাব কথা চালিয়ে গেলো, ‘আপনি জিজ্ঞেস করতে পারলেন না, এত বড় স্পর্ধা ওরা পেলো কোথেকে? ওরা ভেবেছে কি, ওদের পয়সা আছে সে জন্য আমরা গলে

যাবো?’

সালেহা বললেন, ‘থাক। একটু ঠাণ্ডা হ বাবা। অনেক বলেছিস।’

‘না মা, আমি মাথা থেকে এটা নামাতে পারছি না। আমার ইচ্ছা করেছিলো রিকশায় উঠিয়ে দেয়ার পরে একটা লাথি মারি।’

‘এ সব কথা বলে না বাবা। শত হলেও তোর বড় ভাই।’

‘ধুৎ, বড় ভাই! বড় ভাইয়ের গুপ্তি কিলাই।’

‘এই ছেলে, তুই কী বলছিস? তোদেরই তো গুপ্তি।’



নাবিলার খুব মন খারাপ। জীবনে প্রথম যে প্রস্তাবটা এসেছে, সেটা একজন বিবাহিত পুরুষের পক্ষ থেকে। তাও আবার একটা বদ লোকের কাছ থেকে। বুঝা হওয়ার পরে ও যতটুকু শুনছে আর চাচাদের সাথে ওদের সম্পর্ক দেখেছে, তাতে এদের চরিত্রে কোনো ভালো দিক ও দেখতে পায়নি।

কাল রাতে ও ভাতই খায়নি। ওর মা বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরে ওকে বুঝিয়েছেন, ‘তোর মন খারাপ করার কী আছে রে বোকা মেয়ে? তুই মেয়ে মানুষ, বিয়ের কথা তো যে কেউ বলতেই পারে। আর এমন যদি হতো, আমরা তোকে কোনো খারাপ জায়গায় বিয়ে দিচ্ছি, তাহলে একটা কথা ছিলো। তাও তো না।’

নাবিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, ‘তোমরা জুতা দিয়ে দুটা দিতে পারলা না মা?’

‘সব কিছু কি চাইলেই পারা যায় রে মা? ওদের অনেক কুটিল বুদ্ধি। ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করে ফেলবে পরে।’

‘আর কী ক্ষতি করবে?’

‘ওরা মামলায় ওস্তাদ। ধর তোর আবার নামে ওরা একটা মামলা দিয়ে দিলো। তখন পুলিশ কী করবে? পুলিশ এসে তোর আব্বাকে নিয়ে আগে জেলে ঢুকাবে। দেখা যাবে ওনার চাকরিটাও চলে গেছে। আমাদেরকে এই

মহল্লা ছাড়তে হবে। সবাই বলাবলি করবে, শিহাবের আব্বাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।’

ওর মা অনেক কিছু বুঝিয়েছেন ওকে। তারপরও মন খারাপ নিয়েই ঘুমুতে গেছে। ঘুম থেকে ওঠার পরও মন খারাপ যায়নি। ফজরের নামাজ পড়ে জায়নামাজে অনেকক্ষণ বসে ছিলো। চোখের সামনে ও দেখতে পাচ্ছিলো, শামীম নামের গাট্টাগোটা এক লোক পেট বাড়িয়ে হাঁটছে, তার পিছন পিছন ও যাচ্ছে। সুমার সাথে দেখা। সুমা জিজ্ঞেস করলো, ‘কী রে এই গাজী ট্যাংক কোথায় পেলি?’ ও দেখলো, গ্রামের বাড়িতেও শামীমের পিছনে পিছনে ও যাচ্ছে, ছেলেরা ফিসফিসিয়ে বলছে, ‘শামীম মিয়ার দুই নম্বর বৌ না এটা?’ কোনোমতেই কল্পনা থেকে এগুলো সরাতে পারছিলো না।

ওর মা এসে জায়নামাজ থেকে ওকে উঠিয়ে দিলেন। বললেন, ‘রাতে কি ঘুমাতে পারিস নি ঠিকমতো? তাহলে এখন শুয়ে পড়।’

পড়ার টেবিলেও বই খুলে বসে রইলো দুই ঘণ্টা। কোনো পড়া হলো না। অনেক কষ্টে দুটো খেয়ে কলেজে রওনা হলো। সেখানে বান্ধবীদের সাথে কথাবার্তা বললে হয়তো মনটা হালকা হতে পারে।

রাস্তায় ওর দিকে এক নাগাড়ে কারা তাকায়, কোন বখাটেরা শিস দেয়, প্রত্যেক দিন সেগুলো খেয়াল করতে করতে যায়। আজ আর সে দিকে কোনো মনোযোগ নেই। প্রতি দিনের মতো নিচের দিকে তাকিয়েই ও হাঁটছে। কিন্তু আজ আর আশপাশের বিষয়গুলো ওকে আকর্ষণ করতে পারছে না। উল্টো দিক থেকে একটা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আসতে আসতে ড্রেনে পড়ে গেলো। তা দেখে দুটো বাচ্চা হেসে উঠলো। লোকটা ওদের দিকে তেড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করলো। কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব না। ড্রেনের ময়লা পায়ে নিয়ে সে দৌড়াতে পারবে না। অন্য দিন হলে এ বিষয়গুলো ওকেও আনন্দ দিতো। আজ কোনো আনন্দ পাচ্ছে না। ওর মনে হচ্ছে ওর ভিতরটা ছিলো মাছ ভর্তি একটা পুকুরের মতো। মাছগুলো সারাক্ষণ পুকুরটাকে আন্দোলিত রাখতো। আজ পুরো পুকুর বরফ হয়ে গেছে। মাছগুলো সব মারা গেছে। বরফ গলে পানি হলেও মাছগুলোর কোলাহল আর দেখা যাবে না। মায়ের কথামতো নিজেকে বুঝ দেয়ার চেষ্টাও ও করেছে। নিজে নিজেকে বলেছে, নাবিলা তুই বড় হয়েছিস না? এখনো এ রকম মন থাকলে হবে? এটা তো বাচ্চাদের কাজ। এগুলো ঝেড়ে ফ্যাল

বোকা মেয়ে।

কিন্তু ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। এটা নিয়ে ভুগতে হবে বোধ হয় অনেক দিন।

নাজমা ম্যাডাম অ্যাকাউন্টিং পড়াচ্ছেন। ম্যাডামের কথা কানে ঢুকছে ঠিকই; কিন্তু মাথায় ঢুকছে না। এই ম্যাডাম খুব কড়া। যদি ধরে ফেলেন, তাহলে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বেন। এই মহিলা অনেক খারাপ কথা বলেন। মনে হয় প্রত্যেক দিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ঝগড়া করে বের হন। মেজাজ সব সময় গরম থাকে। হাসি কাকে বলে উনি জানেন না। না হাসতে না হাসতে ওনার ঠোঁট মনে হয় শক্ত হয়ে গেছে। এখন আর বিস্তৃত হয় না। ওনার ক্লাশে কেউ বাথরুমে যেতে পারবে না। বাথরুম আগে সেরে আসতে হবে। সে জন্য ওনার ক্লাশ থাকলে মেয়েরা হিশাব করে পানি খায়। ওনার ক্লাশ কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। অসুস্থতার কারণে কেউ না আসতে পারলেও উনি কথা শুনিয়ে ছাড়বেন। তামান্না এক দিন আসেনি। পরের দিন উনি ওর না আসার কারণ জানতে চাইলেন। তামান্না বললো, শরীর খারাপ ছিলো। উনি জানতে চাইলেন, তোমার তো বিয়ে হয়নি। এত শরীর খারাপ কীসের? নাবিলা বুঝতে পারলো না মানুষের শরীর খারাপ হওয়ার সাথে বিয়ের কী সম্পর্ক। তামান্নাও বোঝেনি। ম্যাডাম তামান্নাকে পাঁচ মিনিটের মতো দাঁড় করিয়ে রেখে অনেক কথা শুনিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তামান্না যখন কেঁদে দিয়েছে, তখন উনি ক্ষান্ত হয়েছেন। এই ম্যাডামের অত্যাচারে দুটো মেয়ে টিসি নিয়ে অন্য কলেজে চলে গেছে।

ম্যাডাম যাতে না ধরতে পারেন সে জন্য ও ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে আছে। উনি হয়তো ভাববেন খুব মনোযোগ দিয়ে ও তার লেকচার শুনছে। লেকচারের চেয়ে উনি অঙ্ক করানো শুরু করলে সুবিধা। অঙ্ক করানোর সময় ওনার খেয়াল থাকবে বোর্ডের দিকে। তাতে নাবিলার জন্য সুবিধা হবে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অঙ্ক করাবেন না। থিওরি শুনিয়েই শেষ করবেন।

অনেক কষ্টে নাজমা ম্যাডামের ক্লাশ শেষ হলো। পাশে বসা সিঙ্ঘিয়া খেয়াল করেছে, ওর আজকে মন খারাপ। সিঙ্ঘিয়া খুব ভালো মেয়ে। নাবিলার সাথে ক্লাশের কারোই সে রকম গলায় গলায় ভাব নেই। গলায় গলায় ভাব করতে গেলেও টাকা-পয়সা লাগে। বান্ধবী এক দিন চটপটি খাওয়ালে তাকেও এক

দিন খাওয়াতে হয়। বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে যেতে হয়। গলায় গলায় ভাব না থাকলেও সিঁহিয়ার সাথে নাবিলার অন্য রকম সম্পর্ক। সিঁহিয়া প্রত্যেক দিন ওর কাছে জানতে চায়, কেমন আছো? বেশির ভাগ মেয়ে তুই সম্পর্কে চলে গেলেও এই মেয়ে কাউকে তুই বলে না। সবাইকে সে তুমি বলে। নাবিলাকে কেন সে কাছে টানে নাবিলা জানে না। সুযোগ পেলেই নাবিলার পাশে বসার চেষ্টা করে।

ম্যাডাম যাওয়ার পরে সিঁহিয়া জানতে চাইলো, ‘তোমার কি মন খারাপ?’ নাবিলা কয়েক মুহূর্ত সিঁহিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। এরপর উপরে-নিচে মাথা বাঁকালো। এই মেয়ে ধরে ফেলেছে ওর মন খারাপ। অন্য কেউ এখনো ওকে এ কথা জিজ্ঞেস করেনি।

‘কেন?’ সিঁহিয়া জানতে চাইলো।

নাবিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিছু বলার আগেই সিঁহিয়া বললো, ‘পরে বোলো। পরের ক্লাশ শুরু হতে তো আরো বিশ মিনিট আছে। লাইব্রেরিতে যাই, চলো।’

ওরা লাইব্রেরিতে এসে এক কোনায় বসলো। সিঁহিয়া জানতে চাইলো, ‘কী হয়েছে তোমার, বলো তো।’

‘না, এমনিতেই।’

‘ও, গোপন কিছু?’

‘না।’

‘তাহলে? বাসায় কোনো ঝামেলা হয়েছে?’

‘না, সে রকমও না।’

‘ও, তুমি বলতে চাচ্ছে না?’

‘আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।’

‘তুমি কি এখন বিয়ে করতে চাও না? জানো, আমার না বিয়ে করার অনেক ইচ্ছা। কিন্তু আমার ফ্যামিলিতে কেউ এখন আমাকে বিয়ে দেবে না। তুমি কেন বিয়ে করতে চাও না?’

‘বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে আমার চাচাতো ভাই।’

‘এটা তো আরো ভালো। জানা-শোনা লোককে বিয়ে করা ভালো। আমি আমার খালাতো ভাইকে বলেছিলাম বিয়ে করতে। কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করবে না। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমি কি দেখতে খারাপ? সে জানালো

আমি দেখতে খারাপ না। কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করবে না। সে এই দেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না। ইউকেতে যাবে; সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ অথবা বাংলাদেশী ব্রিটিশ মেয়ে বিয়ে করবে।’

‘আমার চাচাতো ভাইকে আমি জানি বলেই বিয়ে করবো না।’

‘না করলে করবা না। সমস্যা কী? তুমি বলে দাও, তোমার কোনো আগ্রহ নেই।’

‘সেটা আঝা বলে দিয়েছেন।’

‘তাহলে?’

‘এই লোকের আরেকটা বিয়ে ছিলো।’

‘ও! সেই বৌ কি চলে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘এই জন্য তোমার মন খারাপ?’

নাবিলা মাথা নোয়ালো।

‘কিন্তু এতে মন খারাপের কী আছে? বিয়ে যখন হচ্ছেই না...।’

‘জীবনে প্রথম বিয়ের প্রস্তাবটা যদি এ রকম কুৎসিত হয় তাহলে মন খারাপ হবে না?’

‘তা ঠিক। কিন্তু আমাকেও এ রকম কুৎসিত একটা প্রস্তাব দিয়েছিলো একজন।’

‘কে?’

‘তুমি কি সিরাজকে চেনো?’

‘হেরোইন সিরাজ?’

‘হ্যাঁ। সে রাস্তার মধ্যে এক দিন আমার হাত ধরে বলে কি, তুমি আমাকে বিয়ে করবা?’

‘তারপর?’ নাবিলার চোখ বড় হয়ে গেলো।

‘আমি জানতে চাইলাম, আপনাকে বিয়ে করবো কেন? সে বললো, তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমি বললাম, আমাকে তো অনেকেরই ভালো লাগে। শুধু ভালো লাগলে তো আর হবে না। আমি একটু আব্বুকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

অন্য মেয়ে হলে কী করতো? হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতো বা চিৎকার-চৈচামেচি করতো। কিন্তু আমি ওর সাথে কথা চালিয়ে নিচ্ছিলাম। কারণ

আমি জানতাম, ঐ মুহূর্তে রাস্তা ফাঁকা থাকলেও কেউ না কেউ একটু পরে যাবেই। ঠিকই একটু পরে এক লোক যাচ্ছিলো। আমি তাকে ডেকে বললাম, আংকেল বলেন তো, রাস্তার মধ্যে এভাবে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়? বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাবে না আগে?

ততক্ষণে সিরাজ আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। আংকেল দাঁড়ানোর কারণে তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেলো। সিরাজ ভয় পেয়ে গেলো। ও বললো, কী দেখেন আপনারা? এই মেয়ে, তুমি বাসায় যাও।

আমি বাসার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। সেই আংকেল আমাকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। রাতে আকবু আসার পর আকবুকে বললাম। আকবু তার অফিসে সিরাজকে ডেকে নিলেন। তারপর থেকে সিরাজ এই এলাকায় নেই।

‘তোমার আকবুর অনেক টাকা-পয়সা; অনেক লোক। উনি না হয় সিরাজকে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য করেছেন। আমাদের বেলায় কী হতো?’

‘উল্টোটা।’

‘মানে?’

‘তোমরা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। কাউকে না কাউকে তো যেতে হবে, তাই না? এখন শোনো, তোমার বিষয়টা মন খারাপের বিষয়। তবে এত বেশি মন খারাপের কিছু না। আমার তো সবচেয়ে বেশি মন খারাপ থাকার কথা, তাই না? আমার আশু নেই। কোনো ভাই-বোন নেই। বাড়িতে শুধু ফুপু আর আমি থাকি। সাথে দুজন কাজের লোক। আকবু আসেন সপ্তাহে দু দিন কি তিন দিন। কোনো কোনো দিন এসে আবার চলে যান। কিন্তু আমার মন খারাপ হয় না। বাসায় অ্যাকুরিয়াম আছে। আমি মাছের সাথে খেলা করি। ছাদে গিয়ে ফুল গাছের পিছনে সময় দিই। শোপিস বানাই।’

সিহ্নিয়ার আশু মারা গেছেন সিহ্নিয়ার বয়স যখন আট। দ্বিতীয় বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন। পরে সেই বাচ্চাও মারা যায়। সিহ্নিয়ার ফুপুকে তখন ওদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সিহ্নিয়ার ফুপুর বিয়ে হয়নি। উনি বোবা। বছর দুয়েক পর সিহ্নিয়ার আকবু বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি সেই মহিলাকে এ বাড়িতে তুলে আনেননি। উত্তরার দিকে একটা বাসা ভাড়া করে সেখানে রেখেছেন। ওর একটা সৎবোন আছে। সিহ্নিয়া বলে ওদেরকে এ বাড়িতে নিয়ে আসতে। কিন্তু ওর আকবু আনেন না। ও মাঝেমধ্যে গিয়ে বোনকে দেখে আসে। দু বোনের মধ্যে না কি খুব ভাব। ওর সৎমাও ওকে

যথাসম্ভব আদর-যত্ন করেন। হয়তো দূরে থাকার কারণেই। নাবিলা এখন পর্যন্ত কোনো সৎভাই-সৎবোন দেখেনি। আজকাল ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে গেছে দেশে। এতে একই পিতার মায়ের সব সন্তানকে একসাথে দেখা যায় না।

‘তুমি শোপিস বানাতে পারো?’

‘অনেক কিছুই বানাতে পারি। অনেক রান্না জানি। প্রত্যেক দিন এক পদের রান্না করি আমি। গ্রাফিক্স ডিজাইন করি। তুমি গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখবা?’

‘তোমার কাছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার কাছে শিখতে কোনো সমস্যা নেই। আমি ভেবেছিলাম তুমি যেখানো শিখেছো সেখানের কথা বলছো।’

‘আমি তো শিখে ফেলেছি কবে!’

‘গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে গেলে কেন? এর চেয়ে প্রোগ্রামিং শিখতে।’

‘আমার কাছে এটা ভালো লাগে, তাই এটা শিখেছি। যার যেটা ভালো লাগে সেটাই শেখা উচিত, তাই না?’

‘হুম।’ মনে মনে বললো, সেটা তোমাদের বেলায় সম্ভব। তোমার ট্রাকের ড্রাইভারি ভালো লাগলে তুমি সেটাও শিখবা। কে আটকাবে?

‘আমি এটার উপরেই পড়ালেখা করবো।’

‘খুব ভালো। এই পড়ালেখায় সুবিধা আছে। সংজ্ঞা মুখস্থ করতে হবে না। থিওরি পড়তে হবে না। সব কিছু নিজের মতো।’

নাবিলা বাসায় ফিরে শিহাবকে পেয়ে বললো, ‘ভাইয়া, তুমি কম্পোজের দোকানে না ঢুকে গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে পারলা না?’

‘গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে টাকা লাগে।’

‘আমার এক বান্ধবী আছে, সে আমাকে শিখাবে।’

‘মাগনা?’

‘মাগনা না তো কী?’

‘শেখ গিয়ে। জিজ্ঞেস করিস তো আমাকে মাগনা শিখাবে কি না।’

‘আচ্ছা, করবো। কিন্তু মাস্টার তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। তার উপর আবার মেয়ে। অবশ্য সাথে আমি থাকবো।’

‘তোর বান্ধবী মনে হয় খুব সুন্দর?’

‘সুন্দর অবশ্যই। বড়লোকের মেয়েরা বেশির ভাগ সুন্দর হয়। কারণ বড়লোকেরা টাকার বদৌলতে সুন্দরী বৌ পায়। মেয়েরা তো মায়ের ধারাই পায়। সুন্দরের উপর আবার বড়লোকের মেয়ে—তোমার তো নজর পড়তেই পারে।’

‘বড়লোক বলেই তো দুশ্চিন্তা কম। বড়লোকের মেয়েরা গরিব ছেলেকে বিয়ে করে শুনেছিস কোথাও? বড়লোকের ছেলেরা হয়তো রূপের কারণে গরিব মেয়ে বিয়ে করতে পারে; কিন্তু গরিব ছেলের যত রূপ-গুণ থাক, বড়লোকের মেয়েদের তাতে কিছু আসে যায় না।’

‘ঠিকই তো আছে। ছেলেদের রূপ ধুয়ে সে পানি খাওয়ায় কোনো উপকার আছে না কি যে শুধু সুন্দর চেহারার কারণে মেয়েরা ছেলেদের জন্য পাগল হবে?’

‘তাহলে শামীম ভাইর সাথে কথা বলবো? ওনার তো টাকা-পয়সা ভালোই আছে।’

‘ভাইয়া, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। মা, তুমি কিছু বলো না কী জন্য?’ সালেহা ভাত বাড়ছিলেন। কারো পক্ষে না গিয়ে তিনি বললেন, ‘তোরা দুজনেই চুপ কর তো। শান্তিতে ভাত খা।’

৬

সকাল বেলা ওফিশে আসার সময় যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো দিন জ্যামে পড়তে হয়, তখন এই গ্রীষ্মের রোদ শরীরটাকে ঘামিয়ে দেয় বটে; কিন্তু নিজাম সাহেবের বেলায় সেটা খুব কমই ঘটে। ওফিশ দশটায় হলেও তিনি রওনা দেন আটটায়। মোটামুটি সোয়া ঘণ্টায় ওফিশে পৌঁছা যায়। পোনে নয়টায় ওফিশে ঢুকে সবগুলো পত্রিকায় চোখ বোলানো যায়। তার ওফিশে সবার পড়ার জন্য কোনো পত্রিকা রাখা হয় না। উঁচু পদে যারা আছেন, তারা নিজের টাকায় পত্রিকা কিনে পড়েন। সেই পত্রিকাগুলোই একসাথে রিসিপশন

টেবিলে রাখা থাকে। ঢোকান সময় নিজেরটা নিয়ে সবাই ঢোকেন।

নিজামুদ্দিন পত্রিকা কেনেন না অথবা তার পত্রিকা কেনার সাধ্য নেই। তিনশো টাকা মানে তার পরিবারের এক মাসের টুকিটাকি ওষুধের খরচ। শুক্রবার বাজারে যাওয়ার সময় তিনি সেলুনে ঢুকে শিরোনামগুলো দেখেন। অবশ্য নতুন যে সব ওফিসার আসছে, তারাও পত্রিকা কেনে না। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখনকার খবর তখনি জেনে নেয়।

রিসিপশন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পত্রিকাগুলো উল্টাতে উল্টাতে সাড়ে নয়টা বেজে যায়। তখন তিনি বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে যান। চেয়ারে ঠিক দশটার পনেরো মিনিট আগে বসে পড়েন। বছরে পনেরো দিন নৈমিত্তিক ছুটির সুযোগ থাকলেও তিনি তার এই আঠারো বছরের চাকুরি জীবনে ছুটি নিয়েছেন মাত্র দশ দিন। এই দশটা দিনও ছুটি নিয়েছেন কোনো না কোনো জন্ম, মৃত্যু বা বিয়ে উপলক্ষ্যে।

আগে ওফিশে এলেও ওফিশ থেকে দেড়িতে বের হওয়ার অভ্যাস তার নেই। চামচা ধরনের কিছু লোক বসে থাকে বসের সাথে নাস্তা খাওয়ার আশায়। নাস্তা খাওয়ার সাথে সাথে বসের সুনজরে আসার একটা সুযোগও হয়ে যায় তখন। বসের দেড়ি হওয়া মানে কমসে কম রাত আটটা। আর রাত আটটা মানেই নান রুটি, শিক কাবাব, গ্রিল অথবা কাচ্চি।

সময়মতো ওফিশ থেকে বের হলেও বাসায় সময়মতো পৌঁছা যায় না। আসার সময় যেখানে সোয়া ঘণ্টা লাগে, ফেরার সময় সেই রাস্তায়ই আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। বাস পেতে দেড়ি হলে তিন ঘণ্টাও লাগতে পারে। তার ওফিশ মালিবাগে। মালিবাগ থেকে কমলাপুর হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠতে পারলে পঁচিশ মিনিটে উত্তরা পৌঁছা যায়। আর বাসে গেলে আধা ঘণ্টা লাগতে পারে, দু ঘণ্টাও লাগতে পারে। যাদের ওফিশ উত্তরে দিকে আর বাসা দক্ষিণে কিংবা ওফিশ দক্ষিণে আর বাসা উত্তরে, তাদের ফার্মগেট থেকে পল্টন পর্যন্ত যেতেই আট-দশটা সিগনালের কবলে পড়তে হয়।

নিজামুদ্দিন যে কোন সেকশনে আছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। তার কাজ স্টেটমেন্ট তৈরি করা। প্রত্যেক দিন তাকে শত শত পৃষ্ঠা স্টেটমেন্ট প্রিন্ট দিতে হয়। ইদানীং অবশ্য প্রিন্ট কমে আসছে। কিছু কোম্পানি ইমেইলে স্টেটমেন্ট নেয়া শুরু করেছে। নিজামুদ্দিনের কাজের চাপ কমে আসছে। সেই সাথে একটা ভয়ও কাজ করছে। তিনি শুনতে পাচ্ছেন, তাদের কোম্পানির

ওয়েবসাইটেই স্টেটমেন্ট পাওয়া যাবে। তখন আর স্টেটমেন্ট পাঠাতে হবে না। প্রত্যেক পার্টিকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয়া হবে; তারা ওয়েবসাইটে ঢুকে তাদের স্টেটমেন্ট নিয়ে নেবে। এ রকম হলে হয়তো তাকে ওফিশ বলতে পারে, আপনার আর দরকার নেই।

পাশের টেবিলের লোকমান সাহেব এ রকম আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘আরে রাখেন। আপনি কি মনে করেন সব পার্টিই আমাদের মতো অটোমেটিক সিস্টেমে কাজ করে? খোঁজ নিয়ে দেখেন, অনেকের কম্পিউটারই নেই। তারা আমাদের কাছ থেকে প্রিন্ট করেই স্টেটমেন্ট নেবে।’

‘সেটাই যেন হয় খোদা।’ মনে মনে কথাটা বলে পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলগুলো ঠিক করে নিলেন তিনি। প্রত্যেক দিনই কাজ শুরু আগে দোয়াটা করে নেন তিনি। তারপরে বিসমিল্লাহ বলে ড্রয়ার খোলেন। একটা সন্দেশের মধ্যে তিনি আছেন। দোয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়ে নিতে হবে না কি এখন তিনি যেভাবে দোয়া শেষ করার পর বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করেন সেটা ঠিক আছে? মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করবেন মনে করে জিজ্ঞেস করা আর হয়ে ওঠে না।

নতুন ওফিসাররা কম্পিউটারের কোনো দাম দেয় না। কিন্তু তিনি কাজ শুরুর আগে কম্পিউটার ভালো করে মুছে নেন। প্রথম যখন ওফিশে কম্পিউটার আসে, তার মনে আছে, তখন কম্পিউটারের জন্য আলাদা রুম ছিলো। সেখানে পা মুছে ঢুকতে হতো। সবার সেখানে ঢোকান অনুমতি ছিলো না। যিনি কম্পিউটার চালাতেন, তার ভাবই ছিলো আলাদা। তখন থেকেই কম্পিউটারের প্রতি একটা আলাদা সমীহ বজায় রেখে চলেন তিনি।

বাড়িতে বেড়াতে গেলে মোতাহারের রিকশায় চড়া হয়। ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার সময়ই বাড়িতে ফোন করে বলে দেয়া হয় মোতাহারকে জানিয়ে দেয়ার জন্য। মোতাহার ফজরের সময়ই চৌমাথায় রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মোতাহার রিকশার খুব যত্ন করে। রিকশা নিয়ে বের হওয়ার আগে ভালো করে সেটা ঝেড়েমুছে তেল দিয়ে নেয়। নিজামুদ্দিন এ নিয়ে একবার প্রশ্ন করেছিলেন। মোতাহার জবাব দিয়েছিলো, ‘যেটা দিয়া দুইডা পরিবার চলে, হেডার যত্নই তো আগে নেওয়া লাগবে।’

দুই পরিবার বলতে মোতাহারের নিজের পরিবার আর ওর বাপ-মা। ওর

বাপ-মা ওর সাথে থাকে না। কারণ ও বিয়ে করার পর নতুন ভিটায় এসে বাড়ি করেছে। ওর দাদা যে ঘর তুলেছিলেন, সেই ঘরে তাদের ছোট ছেলের সাথে ওর বাপ-মা থাকে। বাপ-মায়ের পুরো খরচ মোতাহার দেয়। হাটখোলায় ওর ছোট ভাইয়ের দর্জির দোকান আছে। কিন্তু তেমন আয় হয় না। তার চেয়ে রিকশা দিয়ে ও বেশি টাকা কামায়। এ ছাড়া ওর দুটো দুধের গরু আছে। কয়েক শতাংশ জমিও কিনেছে নিজের টাকায়। সেখানে যা শাক-সবজি হয়, তাতে বাজার থেকে তরকারি কেনা লাগে না।

মোতাহারের কাছ থেকে নিজামুদ্দিন শিখেছেন, যার মাধ্যমে রোজগার হয়, সেটার যত্ন নিতে হয়। আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা এটা শেখেনি। যে মেশিন থেকে ওদের আয়-রোজগার হতো, সেই মেশিনের পার্টস চুরি করে ওরা বিক্রি করে দিতো। বেশির ভাগ পুলিশই বোঝে না যে, জনগণের ভ্যাট-ট্যাক্সে ওদের পেটের ভাত জোটে। জনগণের সাথে তুই-তোকারি করে; জনগণের গায়ে লাঠি তোলে; লাথি তোলে; জনগণের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো মিথ্যা মামলা দেয়। আদমজী জুট মিল থেকে শ্রমিকদেরকে যে রকম গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নিয়ে বিদায় হতে হয়েছে, এ সব পুলিশকে কি জনগণ এ রকম কোনো এক দিন গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে বিদায় করে দিতে পারে? পুলিশ না কি এখন যুবক ছেলেদেরকে রাস্তার মধ্যে আটকে পকেটে ইয়াবা ঢুকিয়ে অপরাধী বানায়। আজকেও এ রকম একটা খবর এসেছে পত্রিকায়। তারও তো ছেলে আছে। সেও রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে। দুশ্চিন্তা চলে আসে এ সব খবর পড়লে।

দশটা বাজার সাথে সাথেই দুজন হাজির। এটা প্রতি দিনের চিত্র। তার কাছে যারা আসে, তারা খুব ব্যস্ত। স্টেটমেন্ট নিয়ে তাদের নিজেদের ওফিশে যাবে। এরপর ব্যাংকের স্টেটমেন্টের সাথে এই স্টেটমেন্ট মিলিয়ে দেখবে। গত তিন বছরে যদিও তিনি কোনো ভুলের কথা তিনি শোনেননি, কিন্তু কিছু লোক আছে যারা তাদের হিসাবগুলো নানানভাবে মিলিয়ে দেখবে।

তার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে তালেব আর মশিউর। দুজনের বয়সই পঁচিশের নিচে। এ সব দৌড়াদৌড়ির কাজে বেতন খুবই কম হয়। সে জন্য বেশি দিন ছেলেরা এ কাজে থাকে না। হয় মাস এক বছর পরই নতুন লোক আসে।

তিনি দুজনকে বসতে বললেন। দুজনই জানালো, তাদের সময় নেই।
 ‘আরে ভাই, বসেন। বাসা থেকে তো মনে হয় সাতটায় বের হয়েছেন।’
 নিজামুদ্দিন আবারো অনুরোধ জানালেন, ‘বসেন, চা-বিস্কুট খান। শরীরে
 কিছুটা হলেও শক্তি যোগ হবে। বাদশাহ, আলমগীর, এ দিকে চা দিও তো
 ভাই দুইটা।’

ওফিশে দুজন পিওন। একজনের নাম বাদশাহ, আরেকজনের নাম
 আলমগীর। শুধু বাদশাহ বা শুধু আলমগীর বললে দুজনের কেউই শোনে না।
 বাদশাহ মনে করে আমি তো হাজারো কাজ নিয়ে আছি। আলমগীর নিশ্চয়ই
 বসে বসে গান শুনছে। আবার আলমগীর মনে করে বসের সব কাজ তো
 আমিই করি। বাদশাহ ব্যাটা ফাঁক পেলেই সোনিয়া ম্যাডামের কাছে যায়।
 সোনিয়া ম্যাডামের কাছে তোর এত কী? বিষয়টা সে কয়েকজনের নজরে
 আনার চেষ্টাও করেছে। কয়েকজনের মধ্যে নিজামুদ্দিনও ছিলেন।

লোকমান সাহেব তখন চেয়ারে ছিলেন না। আলমগীর চায়ের কাপ রেখে
 বললো, ‘আপনের জন্য ইম্পেশাল চা বানাইছি স্যার।’

নিজামুদ্দিন চুমুক দিতে দিতে বললেন, ‘কী রকম?’

‘বুঝতে পারতাম না? চা থিকা ঘ্রাণ আছে না?’

নিজামুদ্দিন চোখ বুজে ঘ্রাণ বোঝার চেষ্টা করলেন।

আলমগীর বললো, ‘কমলার খোসার গুঁড়া দিছি স্যার। বাসায় শুকাইছি।
 শুকানের পর আমার বৌ গুঁড়া করছে। ওফিশে আইনা রাখছি। ইম্পেশাল
 দুই-একজনের চায়ে এইটা দিই। ভয় নাই স্যার, শুকানের আগে আমার বৌ
 ভালো কইরা ধুইয়া নিছে। ছাদে শুকায় নাই। তাতে পাখির বিষ্ঠার ভয়
 থাকতো। জালি ব্যাগে ঢুকায় জানলার লগে ঝুলায়া রাইখা শুকাইছে।’

‘তাহলে আমি তোমার স্পেশাল লোকদের তালিকায় আছি?’

‘আপনের মতো লোক হয় না কি স্যার? আপনে আইজ পর্যন্ত গলা উঁচা
 কইরা কারু লগে কতা কন নাই।’

‘গলা উঁচু করার জন্য যে পরিমাণ উঁচু চেয়ার লাগে, সে রকম উঁচু চেয়ার তো
 আমার না আলমগীর।’

‘এই বুঝের কারণেই আপনারা ওফিসার হইতে পারছেন আর আমরা চা
 টানি। বাদশাহরে দ্যাখেন। অয় হইলো গিয়া পিওন। অয় যায় সোনিয়া
 ম্যাডামের লগে গপ করতে। ব্যাডা তুই চিন্তা করবি না তুই কই আর

সোনিয়া ম্যাডাম কই? ডাক দিলে কি কুন্স সময় বাদশাহরে পান? পান না। না পাইলে মনে করবেন অয় সোনিয়া ম্যাডামের কাছে গিয়া বইসা রইছে। আমি তো জানি ম্যাডাম অরে কী চোক্ষে দ্যাখে। ম্যাডাম কিন্তু একবারও অর দিকে তাকায় না। উনি ওনার কাজ করতে থাকে আর বাদশাহ যা জিগায় হেইডার জওয়াব দেয় কম্পিউটারের দিকে চোউখ রাইখাই। অয় হা কইরা শুনতে থাকে। মনে হয় ম্যাডাম যদি অর মুখের মধ্যে থুতু ফালায়, তা তো মজা কইরা খাইবোই; উনি চেহারা মোছার পর ময়লার বুড়িতে টিগু না ফালাইয়া অর মুখের মধ্যে ফালাইলে সেইটাও চাবাইবো আর কইবো এমন স্বাদের জিনিশ দুনিয়ায় আর নাই।’

‘তাহলে তুমি বলতে চাও সোনিয়া ম্যাডাম শুধু বাদশাহকে ডাকেন। তোমাকে কখনো কোনো কাজ দেন না?’

‘ম্যাডাম কাউরেই ডাকে না। উনি নিজের চা নিজে নিয়া খায়। নিজের কাম থাকলে দুপুরে খাওয়ার সময় নিচে গিয়া সাইরা আসে।’

এ সমস্যার কারণে দুজনকে একসাথে ডাক দিতে হয়। এতে দুজনই দৌড়ে আসে। নইলে দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ চলে যেতে পারে। আজকে চা নিয়ে এসেছে বাদশাহ।

দ্বিতীয় অনুরোধে তালেব আর মশিউর বসলো। নিজামুদ্দিন বললেন, ‘তালেব ভাই, কোথায় পড়ালেখা করেছেন?’

‘পড়ালেখা এখনো শেষ হয়নি। এমকম পড়ছি।’

‘আর মশিউর ভাই?’

‘আমার পড়ালেখা শেষ হয়েছে আরো তিন বছর আগে।’

‘আচ্ছা। বিয়েশাদি করেছেন?’

‘হ্যাঁ, আমার বাচ্চার বয়স তিন বছর।’

‘মাশাআল্লাহ। এই তো কাজের কাজ করেছেন।’

‘হয়েছে কী, বাড়িতে জমি-জমা আছে ভালোই। আব্বা আছেন; আমার আরো দুই ভাই আছে। আমি না হলেও চলে। এখানে যা ইনকাম হয়, সেটা জমা থাকে। বছর শেষে জমানো টাকা দিয়ে আরো কিছু জমি কিনি।’

‘তাহলে আপনি সহজে এ চাকরি ছাড়বেন না।’

‘দেখা যাক। বিদেশ যাওয়ার চেষ্টায় আছি।’

‘ধুর, বিদেশ যাবেন কেন? বিদেশ কি খুব মজার? এখানে আছেন, অনেক

ভালো আছেন। ঈদে দশ দিন ছুটি কাটান। সপ্তায় সপ্তায় বৌয়ের কাছে যান। কিছু মনে করবেন না। যান তো আশোলে বাপ-মার কাছে, বৌয়ের সাথে একটু দেখা করে আসেন।’

তালেব মুচকি হাসলো এটা শুনে।

‘দ্যাখো, তালেব ভাই আবার হাসে। বিদেশ গেলে তালেব ভাই যেতে পারেন। ধরেন মালয়েশিয়া যদি যান, মালয়েশিয়ার মেয়েরা না কি বাংলাদেশের ছেলেদেরকে পছন্দ করে। তো, সেখানে আপনি কোনো মালয়েশিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেন, ব্যস। আপনার আর ভবিষ্যতে চিন্তা নেই।’

‘আপনার কাছে লাইন-ঘাট আছে না কি?’ তালেব জানতে চাইলো।

‘আমরা ভাই দশটা-ছয়টা চেয়ারে বসে কাটাই। রোদ দেখি না, বৃষ্টি দেখি না, গুলিতে মানুষ মরলে বাসায় যাওয়ার পর জানতে পারি। আমাদের কাছে লাইন-ঘাট থাকবে কোথেকে? কিছু মনে করবেন না। আপনার বেতন কত?’

‘আট।’

‘আরো দুই যোগ হয় না?’

‘তা হয়।’

‘তাহলে এক কাজ করবেন। যদি বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, কোন দেশে কী কাজের ভিসা পাওয়া যায় সেই খোঁজ নেন। সেই কাজটা শিখে ফেলেন। তারপর সেই দেশের ভাষা শেখেন। কোনো দেশে গেলে সেই দেশের ভাষা শেখা দরকার আগে। কাজ আর ভাষা শিখতে আপনার হাজার দশেক টাকা যেতে পারে। ধরে নেন আপনি আট হাজার টাকাই বেতন পান। বাকি দুই হাজারে হাত দেবেন না। কষ্ট হবে অনেক; কিন্তু কিছু করার নেই। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা টিউশনি জোগাড় করতে পারেন। ওফিশের কাজ শেষ হওয়ার পর তো আর কোনো কাজ নেই। তখন টিউশনিটা পড়িয়ে মেসে ফিরবেন। যাক ভাই, অনেক কথা বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না। আপনারা তো মনে হয় পোনে দশটায় এসেছেন এখানে। সিকিউরিটি ভিতরে ঢুকতে দেয়নি দশটার আগে। নেন, চা খান। আর এই নেন আপনারদের স্টেটমেন্ট।’

তালেব আর মশিউর বিদায় নেয়ার পর লোকমান সাহেব বললেন, ‘নিজাম

ভাই দেখি পরামর্শ কেন্দ্র খুলে বসেছেন। আপনি তো এ জন্য ফি নিতে পারেন।’

‘এটা কি আর আমেরিকা যে কাউন্সেলিং করে পয়সা পাবেন? এ দেশে পরামর্শ নেয়ার লোকের চেয়ে পরামর্শ দেয়ার লোক বেশি।’

‘পরামর্শ দেয়ার লোক বেশি হলেও কাজের পরামর্শ দেয়ার লোক পাবেন না। ধরেন আপনার ছেলে বা মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। ওকে কোথায় পড়াবেন তা নিয়ে দেখবেন পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই। কিন্তু ও ওর মেধা আর ইচ্ছার সংযোগে কোন জায়গায় খাপ খাবে, সে রকম পরামর্শ দেয়ার মতো জানলেওয়ালা লোক পাবেন না।’

‘না ভাই। আমরা তো জীবন শেষ করে দিলাম। এই ছেলেগুলো কী পরিমাণ পরিশ্রম করে দেখেন। অথচ বেতন পায় কত! এরাই যদি বাড়িতে গরু পালতো বা ফল চাষ করতো, মাসে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা কামাতে পারতো; অর্ধেক টাকা জমাতে পারতো। সেখানে কিন্তু এর অর্ধেক পরিশ্রম দেয়া লাগতো। ঘরের ছেলে ঘরে থাকতো; বৌ-বাচ্চা নিয়ে আনন্দ-ফুটি করতো। কিন্তু আমরা চাষাবাদকে এমন চোখে দেখি, কোনো চাষীর ছেলে আর চাষাবাদে যাচ্ছে না। বই-পত্রের দেখবেন ডায়ালগ থাকে : চাষার ছেলে ওমুক হয়েছে, তমুক হয়েছে। আরে, একটা ছেলে ভালো কিছু করেছে, ঠিক আছে। কিন্তু হেডলাইনে লেখার দরকার কী সে চাষার ছেলে? এ সব পরিশ্রমী ছেলের জন্য বিদেশই ঠিক আছে।’

‘চাষাবাদে মানুষের আত্মহা এভাবে হারানোর কারণে এক সময় কী হবে জানানো? অনাবাদী জমিগুলো বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কিনে ফেলবে। তারপর যার জমি কিনে তারা চাষাবাদ শুরু করবে সে অথবা তার ছেলেই সেই প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকরি করার জন্য ধরনা দেবে। আপনি দেখবেন এটা খুব শিগগিরই শুরু হবে। জমির ব্যবসা করতে গিয়ে হাউজিং কোম্পানিগুলো ধরা খেয়েছে না? ওরা কি বিকল্প খুঁজছে না? চাষাবাদই হবে ওদের জন্য সেরা বিকল্প।’

‘সমস্যা কী? তখন আমরা আরো বড় লোক হবো। পাঁচশো টাকা কেজি তরকারি খাবো।’

‘জাপানের মতো?’

‘জাপানে তো কৃষকরাই চাষাবাদ করে। ওরা যাতে কৃষি পেশা বাদ না দেয়

সে জন্য খাবারের দাম বেশি। কিন্তু আপনার দেশে কৃষকও ঠকে; সাধারণ জনগণও মরে।’

‘হ্যাঁ, খারাপ বলেননি। এটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এই যে গত সপ্তাহে আম কিনতে গেলাম। বাইরে আম পঞ্চাশ টাকা। ইস্পাহানিতে গেলাম, একশো বিশ টাকা কেজি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঘটনা কী? দামের এত হেরফের কেন? সেলসম্যান আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করলো আমরা বাগান থেকে বাছাই করে আনি। আমি বললাম, তাহলে তো বাইরের চেয়ে আপনাদের এখানে দাম কম হওয়ার কথা। বাইরের আম তিন হাত ঘুরে কাস্টমারের কাছে যায়। আর আপনারা নিজেদের আম নিজেরা সরাসরি বিক্রি করছেন। এ কথায় ছেলেটা চুপ মেরে অন্য কাস্টমারের দিকে মনোযোগ দিলো।’

‘শুধু তাই না। বাইরে থেকে কিনতে গেলে পাঁচ কেজিতে আপনি হয়তো পাঁচ-দশ টাকা কমও দেবেন। কিন্তু ওদের ওখানে গ্রাম হিসাবে দাম দিয়ে আসতে হবে।’

লোকমান সাহেব দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

লোকমান সাহেব অ্যাকাউন্টসের অধীনে থাকলেও তিনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বসেন না। এখানেই নিজামুদ্দিনের পাশে আছেন। নিজামুদ্দিনের চেয়ে লোকমান সাহেব একটু সিনিয়র। কিন্তু তাতে তাদের ভাই-ভাই সম্পর্কে কোনো সমস্যা হয় না। লোকমান সাহেব প্রায়ই নিজামুদ্দিনকে বলেন, ‘নিজাম ভাই, এই যে ভাই ভাই একটা সম্পর্ক, বাংলাদেশের বাইরে কি এটা আছে?’

নিজামুদ্দিনও সাথে সাথে বলে দেন, ‘আমার তো মনে হয় না।’

‘তবে এটা কিন্তু বদলে যাচ্ছে। আমরা যেমন যে পেশার লোকই হোক, কাছাকাছি বয়সের হলে ভাই বলি। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা রিকশাওয়ালাদেরকে তুমি বলে। দেখা যাবে বিশ বছরের ছেলে যে রিকশাওয়ালাকে তুমি বলছে, সেই রিকশাওয়ালার বয়স ওর বড় চাচার চেয়েও বেশি।’

‘কী করবেন? আমরা তো অনেক ভাই-বোন ছিলাম; কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে আমাদের মা-বাপ বিরক্ত হননি। তারা যেটুকু আদব-কায়দা জানতেন আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখনকার মা-বাপ দুই বাচ্চা জন্ম দিয়েই ক্লান্ত হয়ে যায়। শিখাবে কখন? আড়াই বছর বয়স হওয়ার সাথে সাথে স্কুলে

দেয়। স্কুলে কি সব শিখায়?’

লোকমান সাহেব তার ডিপার্টমেন্টে বসলে এ সব কথাবার্তা বলবেন কার সাথে? তার ডিপার্টমেন্টে সব ছেলেপেলে। সেখানে তিনি খুব একটা যুৎ করতে পারেন না। এ জন্য ওফিশ থেকে তিনি পাশ করে নিয়েছেন, তিনি এখানেই বসবেন।

লোকমান সাহেব সিনিয়র হলেও নিজামুদ্দিন আর তিনি একই গ্রেডের লোক। এ সব একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে খুব একটা প্রমোশন হয় না। পোস্টও থাকে সামান্য। উপরের দিকে কিছু ভালো পোস্ট থাকে। নিচের দিকে সব একাকার। নিজামুদ্দিন সেই কবে থার্ড গ্রেডে ঢুকেছিলেন, এখনো সেই গ্রেডেই আছেন। লোকমান সাহেব তো আরো আগের।

অবসরে গেলে কী সুবিধা পাবেন তাও তারা জানেন না।

থার্ড ক্লাশ পাওয়ার চেয়ে ফেল করা অনেক ভালো। যারা ফেল করে তাদের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আর থার্ড ক্লাশ পাওয়াদের কোনো গতি হয় না। নিজামুদ্দিন মাঝে-মধ্যে ভাবেন, এ জীবনে কোনো একটা পর্যায়ে যদি তিনি ফেল করতে পারতেন!

৭

স্বামীকে বিদায় দেয়ার পর সালেহা চাল বাছতে বসেছেন। তিনি বসেছেন দরজা বরাবর আলোর দিকে মুখ করে। আজকাল দুই নম্বর চাউলেও কোনো মরা চাল, ধান অথবা পাথর থাকে না। কিন্তু তারা খান তিন নম্বর চাল। মিনিকেট হলো দুই নম্বর চাল। তারা খান আটাশ-উনত্রিশ। আটাশ-উনত্রিশ এক নম্বর চালের কাতারে পড়ে না।

চাল বাছা শেষ পর্যায়ে। এমন সময় তার কুলার উপরে একটা ছায়া পড়লো। তিনি মুখ তুলে তাকালেন। চোখাচোখি হওয়ার সাথে সাথে মেয়েটা সুন্দর একটা হাসি দিলো। শুধু সুন্দর হাসি না। নির্মল হাসি। গাছের নতুন পাতা বের হলে দুই পাতার মাঝে যে রকম বলতে গেলে কোনো ফাঁকা থাকে না,

তারপরও সামান্য বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা পাতা জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই মেয়েটার হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। মেয়েটার দুই ঠোঁটের মাঝখানেও বলতে গেলে ফাঁকা নেই। এত সুন্দর হাসি কি মেয়েটার স্বভাবজাত না কোথাও শিখেছে? আজকাল তো সব কিছুই শেখা যায়। হয়তো হাসি শিক্ষার কোনো স্কুলও আছে।

মেয়েটা বললো, ‘আন্টি, ঢুকতে দেবেন না?’

নাবিলা গলা বাড়িয়ে বললো, ‘সিঙ্ঘিয়া, তুমি?’

ও, তাহলে এই মেয়ের নাম সিঙ্ঘিয়া? নাবিলা বলেছিলো, ওদের ক্লাশে মা মরা একটা মেয়ে আছে। একেবারে চূপচাপ থাকে।

সালেহা কুলাটা নিজের দিকে টেনে এনে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যাঁ মা, আসো আসো।’

ভিতরে ঢুকে সিঙ্ঘিয়া নাবিলাকে বললো, ‘হ্যাঁ। কেন, আশ্চর্য হয়েছো না কি?’
‘তা কিছুটা।’

‘এখন থেকে প্রত্যেক দিন আসবো। তোমার সাথে কলেজে যাবো। সমস্যা নেই তো?’

নাবিলা চেয়ারটা টেনে দিয়ে নিজে গিয়ে খাটে বসেছে। সিঙ্ঘিয়ার কথার জবাবে বললো, ‘আমার সমস্যা কীসের? আমার আরো ভালো হবে। এত দিন যেতাম যেভাবে, এখনো সেভাবেই যাবো। রাস্তা একই। মাঝখানে একজন সঙ্গী পেলাম। সমস্যা তো হবে তোমার। কষ্ট করে আমার বাসায় আসতে হবে। আবার আগে চলে এলে বসে থাকতে হবে।’

‘আগে চলে আসার সম্ভাবনা কম। বরং আমার কারণে তোমার দেরি হতে পারে প্রায় দিনই।’ সিঙ্ঘিয়া বলে যেতে লাগলো, ‘কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনই আব্দুকে বলেছি, আমি গাড়িতে যাবো না। আব্দু সে কারণে মাসিক চুক্তিতে একটা রিকশা ঠিক করলো। প্রথমে চেয়েছিলো কিনতে। জালাল কাকু মানা করে দিলেন। বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যে রিকশাওয়ালা এসে বলবে রিকশা চুরি হয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং ভাড়া করা রিকশা আমাকে প্রত্যেক দিন কলেজে নিয়ে যাবে, আবার বাসায় নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রথম দিনেই চুক্তি বাতিল।’

‘কেন? সে কি কিছু করেছিলো?’

‘না, কিছু করেনি। আমার একটা সমস্যা হলো ঘামের গন্ধ সহ্য করতে পারি

না। প্রায় বমি চলে আসে। এই লোকের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসতো।’

‘সারা দিন রোদে রিকশা চালাবে, তাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসবে না?’

‘এজন্যই রিকশাওয়ালায় সিট আর রিকশার যাত্রীদের সিটের মাঝখানে বিশাল দূরত্ব। এই দূরত্ব পার হয়েও যদি ঘামের গন্ধ চলে আসে, তাহলে সমস্যা না?’

‘হুম, সমস্যা।’

‘সে জন্য আমি যেটা করি, তা হলো রিকশায় ওঠার আগে রিকশাওয়ালার সাথে কোথায় যাবো অথবা ভাড়া কত সেটা নিয়ে কথা বলে। এর মধ্যে বুঝে নিই তার রিকশায় চড়া যাবে কি না।’

‘রিকশায় চড়ার দরকার কী তোমার?’

সিহিয়া এর বিপরীতে কিছু না বলে জানতে চাইলো, ‘পড়ছিল না কি?’

‘হ্যাঁ। রাতে পড়া হয় না। সকালে নিরিবিলা যতটুকু পারি, পড়ি।’

‘আমার কখনোই পড়তে মন চায় না।’

‘তোমার আর চিন্তা কী?’ মনে মনে বললো, ফেল করলেও সমস্যা নেই। বাপের টাকা আছে; বিদেশ চলে যাবা।

সিহিয়ার আসার অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে। নাবিলার ভাইকে ও দেখতে এসেছে। নাবিলার চেহারা যেহেতু ধারালো, ওর ভাইয়ের চেহারাও তেমন হবে—মনে মনে এ রকম একটা ধারণা কয়েক দিন আগে হঠাৎ করে জেগে উঠলো। তারপর ভাবলো, নাবিলাদের বাসায় গিয়ে দেখে এলেই তো হয়, ওর ভাইয়ের চেহারা কেমন। নাবিলার ভাইকে কেন দেখতে মন চাইছে, সিহিয়া নিজেও জানে না। ওর মধ্যে কি শুধু তাকে দেখার আগ্রহ? সাগর-পাহাড় দেখার যে রকম প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে মানুষের মধ্যে, সে রকম? দেখার পর আবার সেগুলো স্বাভাবিক হয়ে যায়। না কি অন্য কোনো সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য আছে?

সিহিয়া মনের মধ্যে জাল ফেলা শুরু করলো। এ রকমটা ওর প্রায়ই ঘটে। কোনো একটা কাজ করতে গেছে, মাঝখানে মনে হলো—আরে, এ কাজটার পিছনে আশোল কারণ কী? মনের মধ্যে তখন আশোল কারণ খোঁজা শুরু হয়ে যায়। ও কারণ খোঁজার এ কাজটার নাম দিয়েছে জাল ফেলা। ওর নাহিদ মামা কাতার থাকেন। দেশে চলে আসেন কাউকে কিছু না জানিয়ে। ওদের বাড়িতে ঢুকেই বলবেন, ‘সিহিয়া চল, বাড়িতে যাই?’

‘এটা কেমন কথা মামা? আমার কলেজ খোলা না? আর আপনি কেবল এসেছেন। বসেন, আজকে পাশ্চাত্যের সাথে ডালের বড়া হচ্ছে। ভাত খান। গোসল করে একটা ঘুম দিন। তারপর যাওয়ার চিন্তা করবেন।’

‘আরে বেটি, দোহা থেকে ঢাকা আসতে যে সময় লাগে, চাকরিতে তার চেয়ে বেশি সময়ের কাজ নিয়েও ও দেশে ছুটতে হয়। সে কাজ শেষ করে আসার পর আবার ওফিশের কাজে লেগে যেতে হয়। এগুলো কোনো বিষয় না। তুই রেডি হ। বেশি কিছু নেয়া লাগবে না। এক সেট জামা-কাপড় হলেই চলবে। আগামীকাল আবার তোকে দিয়ে যাবো। আমাদের কুমিল্লা হলো এক দিন বেড়ানোর জন্য। চট্টগ্রাম-রাজশাহী আবার এক দিনে পোষায় না; অন্তত তিন দিন থাকতে হয়।’

এরপর তিনি ওর আব্বুকে ফোন করে বলবেন, ‘দুলাভাই, সিঙ্ঘিয়ার সাথে আমি ওর নানা বাড়ি যাচ্ছি।’

আব্বু বলবেন, ‘সিঙ্ঘিয়ার সাথে তুমি ওর নানা বাড়ি যাচ্ছে মানো? এটা কেমন কথা? তোমাদের বাড়িতে তুমি যাচ্ছে, সাথে ভাগ্নীকে নিতে চাও। আর তুমি এসেছো কখন?’

‘নামলাম ঘণ্টা দেড়েক আগে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে বাড়িতে থাকার পরিকল্পনা। চাইলে আপনি আগামীকাল গিয়ে যোগ দিতে পারেন। পুকুরে জাল ফেলা হবে। ধৃত মৎস ওখানে রান্না করে খেতে চাইলে সে ব্যবস্থা করা হবে; জ্যাক্ত অবস্থায় ঢাকা নিয়ে আসতে চাইলে তারও চেষ্টা করা হবে।’

এরপর নাহিদ মামা ওর হাতে বাসের টিকিট দিয়ে বলবেন, ‘নে, টিকিটগুলো তোর কাছে রাখ। আমি বাসে উঠেই ঘুম দেবো। সুপারভাইজার যখন আসবে, আগেই বলে দিবি আমার ঘুম না ভাঙ্গানোর জন্য।’

মামা বাড়িতে গিয়ে জাল ফেলার বিশাল আয়োজন করবেন। গ্রামে তার যত বন্ধু আছে তারা আগেই হাজির থাকে। ছোট মামার কাছ থেকে প্রশ্ন করে নাহিদ মামা আগেভাগে জেন নেন পুকুরের সবচেয়ে বড় মাছটা কী মাছ আর সেটার আকৃতি কী রকম। সেটা না যে পর্যন্ত ধরা না পড়ে ততক্ষণ তার জাল ফেলা চলতে থাকে।

সিঙ্ঘিয়ারও তেমনি জাল ফেলা চলছে। জাল ফেলে ফেলে মনের কাছেই প্রশ্ন করবে, ‘আমার এ কাজের পিছনে কারণ কি এটা?’

মন বলবে, ‘না, এটা না।’

আবার জাল ফেলা হবে। আরেকটা কারণ উঠে আসবে। ও প্রশ্ন করবে, ‘এটা কি হতে পারে?’

‘আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। তবে আশোল কারণ এটাও না হয়তো।’

যে কাজের কারণ খুঁজছে সে কাজটাই হচ্ছে না বোধ হয়। নাবিলার ভাই বাসায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। তারপরও জানার জন্য প্রশ্ন করা শুরু করলো, ‘আংকেল ওফিশে চলে গেছেন?’

‘হ্যাঁ। অনেক আগে।’

‘এটাই কি তোমার রুম?’

‘আমার রুম ঠিক বলা যাবে না; আমি এখানে ঘুমাই। কখনো কখনো ভাইয়া ঘুমায়।’

‘কখনো কখনো মানে? তোমার ভাইয়া...।’

‘ভাইয়া মেসে থাকে। মাসের মধ্যে দু-এক দিন বাসায় এসে থাকে।’

‘ও।’

হতাশ হতে হলো সিহিয়াকে। তাহলে ওর ভাইয়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়তো কোনো এক দিন দেখা হয়ে যেতে পারে।

নাবিলা বললো, ‘মুড়ি খাবা? দেশী মুড়ি। কেমিকেল নেই।’

সালেহা বললেন, ‘কী বলছিস মুড়ি খাবে? শুধু মুড়ি চিবাবে কী জন্য? আমি ডিম পোচ করে দিচ্ছি।’

সিহিয়া সালেহার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘না আন্টি। আমি খেয়েই এসেছি। এখন আর কিছু খাবো না।’

মুখে আবার সেই হাসি। সালেহা আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পরে কোনো বেলা যদি রান্না না করে, স্বামী এলে একটা হাসি দিয়ে বলবে, রান্না করিনি। ওর স্বামী সেই হাসি খেয়েই সে বেলা পার করে দিতে পারবে।

মেয়েটা কি এ সব খাবার দেখে খেতে চাইছে না? যে মেয়ে এ বাড়িতে আসতে পেরেছে, সে এ বাড়ির খাবারও খেতে পারার কথা। তা ছাড়া ওকে তো আর স্ট্রিকি বা কচু খেতে বলা হয়নি। এ দুটো খাবার অনেকে খায় না। তারপরও সালেহার খারাপ লাগতে শুরু করেছে। মেয়েটা আজ প্রথম এসেছে। একেবারে খালি মুখে চলে যাবে? শিহাব থাকলে ভালো হতো। দোকান থেকে একটা কিছু আনানো যেতো। শিহাব অনেক সময় দিনের

বেলাও হুটহাট চলে আসে। এসেই বলবে, ‘মা, খাওয়ার কী আছে?’ বলে নিজেই যেটা সামনে পাবে নিয়ে খাওয়া শুরু করবে। সালেহা এখন চাইছেন শিহাব আসুক। মায়ের মন চাইলে না কি অনেক কিছু হয়।

মেয়ে দুটো থেমে থেমে এটা-ওটা কথা বলছে। তিনি থাকায় মনে হচ্ছে সুবিধা করতে পারছে না। তিনি উঠে গেলেন।

সিঁথিয়া কিছুক্ষণ পরপর ঘাড় ঘুরাচ্ছিলো। নাবিলা বললো, ‘দেখার কিছু নেই। উপরে শামিয়ানা টানানো। কারণ টিনের নিচে বাঁশের বেড়ার সিলিং দেয়া। সেটাকে শামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আর এই যে টেবিল দেখতে পাচ্ছে, এর বয়স আমার বয়সের চেয়ে বেশি। আক্কা বাড়ি থেকে কাঠ নিয়ে এসেছিলেন। সেই কাঠ দিয়ে এটা বানানো হয়েছে। আরো তিনটা জিনিশ আছে আমাদের ঘরে, সেগুলোর বয়স আর মা-আক্কার বিয়ের বয়স সমান। মানে বিয়ের সময় ওনাদেরকে নানী বানিয়ে দিয়েছিলেন। দুটো বসার পিঁড়ি আর একটা রুটি বানানোর পিঁড়ি। পাটা ছিলো একটা সমান বয়সী; কিন্তু আগের বাসা বদলিয়ে এই বাসায় আসার সময় সেটা গায়েব হয়ে গেছে। পুতাটা সঙ্গীর অভাবে একা একা খাটের নিচে কাঁদছে। ভিতরে আরেকটা রুম আছে। সেখানে একটা শোকেস আছে। সেটা এর আগের আগের বাসায় থাকতে এক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে মা কিনে রেখেছেন। তারা ঢাকা ছেড়ে একেবারে গ্রামে চলে গিয়েছিলো। যাওয়ার সময় অনেক মালামাল বিক্রি করে গেছে।’

‘আমি তোমাদের ঘর নিয়ে ভাবছি না। মানুষের অবস্থা সব সময় এক থাকে না। আব্বুও এক সময় অনেক কষ্টে ছিলেন। আমাকে বলেছেন। মানুষের জীবনে এগুলো থাকেই। আমি ভাবছি, তোমরা কী সুন্দর আব্বু-আম্মু, ভাই-বোন একসাথে আছো।’

‘তুমি এক কাজ করতে পারো। কাউকে বিয়ে করে ফেলো। তাহলে আর একাকী থাকতে হবে না। এমন কাউকে বিয়ে করবা, যে মা-বাপ, ভাই-বোনকে নিয়ে একসাথে থাকে।’

‘হ্যাঁ, তা খারাপ হয় না। কিন্তু আমাকে তো সে রকম কেউ বিয়ের কথা বলেনি। বললে ভেবে দেখতাম। আমাকে বিয়ে করতে চায় হেরোইনখোর। হেরোইনখোরের বাড়িতেও অনেক লোক থাকে। তবে তারা হেরোইনখোরের আত্মীয়-স্বজন না। হেরোইনখোরের আত্মীয়রা হেরোইনখোরের বাড়িতে

আসে না। অন্য হেরোইনখোররা এসে সেখানে ভিড় করে।’

এর মধ্যে সালেহা যাওয়া-আসা নিয়ে মোট তিন দু গুণে ছয়বার সিঁহিয়াকে দেখে গেলেন। মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গিও সুন্দর। আন্তে আন্তে কথা বলে। প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা। কণ্ঠটা মোলায়েম। গৌরনদীর ছানার মতো। কথা শুনলে মনে হয় গৌরনদীর ছানা খাচ্ছি। ওর মা মরে গিয়ে কি ওকে এ রকম দারুণ দারুণ জিনিশ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন? এই মেয়ে কি জানে ওর মধ্যে এত কিছু আছে? ওর স্বামী সত্যিই পৃথিবীর এক হাজার ভাগ্যবানের একজন হবে।

বারবার এভাবে যাওয়া-আসার অস্থিরতায়, না কি মেয়েটার সামনে ভালো কিছু খাবার দিতে না পারার আফসোসে না কি মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে সালেহা তৃতীয়বার আর রান্না ঘরে যেতে পারলেন না। দরজার সামনে পড়ে গেলেন।

৮

ঢাকার রাজত্ব রিকশাওয়ালাদের হাতে। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তার দু পায়ের মাঝখানে রিকশাওয়ালা সামনের চাকাটা ঢুকিয়ে দেবে। কেউ রাস্তা পার হতে চাইলে দেখা যাবে মানব বন্ধনের মতো রিকশাওয়ালারা রিকশা বন্ধন পালন করছে। রিকশার যে জায়গাটা সবচেয়ে বেশি চকচক করে তা হলো পিছনের বাম্পার। সাইকেলের জন্য এমন কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এই রিকশার রাজত্বের মধ্যেই শিহাব সাইকেল চালায়। ওরা অবশ্য ঢাকায় থাকলেও সিটি কর্পোরেশনের বাইরে। সে জন্যই চালানো সম্ভব। নগরীর মধ্যে হলে সম্ভব হতো না।

নাবিলা ফোন দিয়েছে বাসা থেকে। ওর মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। নাবিলা যখন ফোনটা দেয়, শিহাব তখন একটা কম্পোজের কাজের মাঝখানে ছিলো। শোনার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে দোকানের মালিক দেলোয়ারকে বললো,

‘দেলোয়ার ভাই, আমি বাসায় গেলাম। জরুরী।’ দেলোয়ারকে কিছু বলার সুযোগ দিলো না। নিচে নেমেই সাইকেলে টান।

দোকান থেকে বাসায় সাইকেলে যেতে বারো মিনিট লাগে। আরো চার মিনিট বাকি আছে। এর মধ্যে তিনবার মোবাইল বেজে উঠেছে। নাবিলাই ফোন করছে হয়তো। তাড়াতাড়ি চালাতে চাইলেও খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হচ্ছে না। রাস্তা ভাঙ্গাচোরা। ইট-বালির ট্রাকগুলো রাস্তা গর্ত করে ফেলে। সেই গর্তে আবার ভাঙ্গা দালানের ইট-সিমেন্ট ফেলা হয়। তখন রাস্তার অবস্থা আরো করুণ হয়ে যায়। এই রাস্তা এখন সেই করুণ অবস্থায় আছে।

বাসায় পৌঁছে দেখলো ওর মা পুরো অজ্ঞান নন; গলা থেকে গোঙ্গানির আওয়াজ বেরুচ্ছে। মাঝেমধ্যে বাম হাতটা নাড়ানোর চেষ্টা করছেন। নাবিলা কাঁদছে। আরো একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ওকে দেখে সে একটু সরে বসলো। শিহাব জিজ্ঞেস করলো, ‘গরম লাগছে মা?’

কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

শিহাব আধা মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। আশেপাশের ক্লিনিকে নিয়ে কোনো লাভ নেই। ঢাকা মেডিকেল অনেক দূর। তা ছাড়া সেখানকার ডাক্তাররা ইচ্ছামতো রোগী দেখবে। রোগী মারা গেলে তাদের কিছু যায়-আসে না। প্রাইভেটেই নিতে হবে; তবে টাকা খরচ কম হয় এমন কোনো প্রাইভেট হাসপাতালে। ক্লিনিকে নয়।

কিন্তু ওর পকেটে মনে হয় পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে। কী এক বোকামি করলো! দেলোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে হাজারখানেক টাকা নিয়ে আসা উচিত ছিলো না? মাথার চুলে হাত চালিয়ে ভেবে নিলো, কার কাছে টাকা চাওয়া যেতে পারে। এই বাড়িতে কারো কাছে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ বাড়ির মহিলাদের কাছে এত টাকা থাকার কথা না। বাড়িওয়ালার কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে? পাশের বাড়ির খলিল সাহেবের কাছে যেতে হবে। খলিল সাহেব সরকারী চাকরি করেন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কিন্তু খলিল সাহেব সবার আগে এই মহল্লায় পাঁচ তলা বাড়ি করেছেন। উনি যখন মন চায় ওফিশে যান; ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আবার চলে আসেন।

কলিং বেল টেপার পর খলিল সাহেবের স্ত্রী জানতে চাইলেন, ‘কে?’

‘খালান্মা, আমি শিহাব। কাকা আছেন না কি?’

‘আছে তো।’

‘একটু কথা ছিলো।’

‘আচ্ছা, দাঁড়াও।’

শিহাব ঘড়িতে দেখলো সাড়ে চার মিনিট পর খলিল সাহেব নেমেছেন। হাতে চাবি নেই। তার মানে শিহাবকে উপরে নিয়ে বসানোর কোনো ইচ্ছা তার নেই। কলাপসিবল গেটের ভিতরে থেকেই তিনি কথা শেষ করতে চান। খালি গায়ে লুঙ্গির গিট ঠিক করতে করতে তিনি জানতে চাইলেন, ‘কী হইছে শিহাব?’

‘একটু কথা আছে কাকা।’

‘কও।’ তিনি কাছে এলেন।

‘মা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তো, হাসপাতালে নিতে চাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার হাতে টাকা নেই। হাজারখানেক টাকা হলে হয়ে যেতো। রাতের দিকে ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন।’

খলিল সাহেব কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। এই সময়টাতে তিনি শিহাবের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, ‘আমার কাছে তো কোনো ট্যাকা নাই। ট্যাকা ব্যাংকেই থাকে। যখন লাগে তখন উডাই।’ এটুকু বলে শেষ করলেও হতো। তিনি আরো কিছু কথা ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেন। ‘অহন আমার ওফিশে যাওয়ার সময়।’ মানে এখন কেন এসেছো? ‘ঠিক আছে।’ মানে তুমি চলে যাও। ‘ঠিক আছে’ বলেই তিনি উপরে ওঠার জন্য ঘুরে গেলেন।

খলিল সাহেবের বাড়ি থেকে বের হতে হতে বন্ধু জিয়াদকে ফোন দিলো শিহাব। এভাবে একেজনের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। জিয়াদকে বললো, ‘জিয়াদ, তুই যেভাবে হোক এই মুহূর্তে আমার মোবাইল অ্যাকাউন্টে দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে দে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে। পরে কথা বলবো তোর সাথে।’

সিহুয়াকে নাবিলা বললো, ‘তুমি তাহলে কলেজে যাও।’

‘আমাকে ফোন করে জানিও কিন্তু কী অবস্থা।’

‘ঠিক আছে, জানাবো। গেলাম ভাইয়া।’

শিহাব কিছু বললো না। শুধু ঘাড় কাত করলো।

মেইন রোডের মোড়ে আসতে আসতে মোবাইল কেঁপে উঠলো। তার মানে

টাকা চলে এসেছে। শিহাব নাবিলাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুই কি মাকে ধরে রাখতে পারবি?’

নাবিলা কিছু বললো না।

শিহাব বললো, ‘বুঝেছি। তুই নাম ধীরে ধীরে। আমিই মাকে ধরে রাখছি। আমার পকেট থেকে মোবাইল বের করে লোডের দোকানে যা। পিন টু জিরো ওয়ান টু। দুই হাজার টাকা তুলে আনবি। এরপর রাস্তার ও পাশে গিয়ে সিএনজি ঠিক করবি। বলবি রাজলক্ষ্মী যাবো। একশো বিশে রাজি করানোর চেষ্টা করবি। একশো আশির উপরে যাবি না।’

শিহাব যা ভেবেছিলো তার চেয়ে অল্প সময়ে নাবিলা কাজ সেরে আসতে পেরেছে। মেয়ে বলে হয়তো সবখানে অগ্রাধিকার পেয়েছে। রিকশায় তিনজন আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে। শিহাব আর নাবিলা দুজন দুই পাশে বসেছে; ওর মাকে নিয়েছে মাঝখানে। রিকশার সিটের উপরে মূলত দুইজনই ছিলো। ওর মা আর নাবিলা। শিহাব নিজেকে সিটের ঘাড়ের উপরে ঠেকিয়ে রেখে এসেছে। সিএনজিতে সেই সমস্যাটা থাকলো না। দুজন সিটে বসে মাকে কোলের উপরে শুইয়ে নিলো।

হাসপাতালে আনার পর ইমার্জেন্সিতে রোগীকে একটা সেলাইন দেয়া হলো। শিহাবকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো, ‘রোগী আপনার কী হন?’

‘মা।’

‘আপনার মায়ের এমনিতে কোনো সমস্যা নেই। ওনার শরীর দুর্বল। সেলাইন শেষ হলে বাসায় নিয়ে যাবেন। চাইলে সেলাইন লাগানো অবস্থায়ও নিয়ে যেতে পারেন। ভালো ভালো খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন।’

সেলাইন শেষ হতে তিন ঘণ্টা লাগবে। তার চেয়ে বাসায় চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ওদেরও খাওয়া দরকার। নাবিলাকে বললো, ‘চল, দুপুরের খাবার খেয়ে আসি।’

‘আমি বাসায় গিয়ে খাবো। তুমি গিয়ে খেয়ে আসো।’

‘তুইও কি মায়ের মতো পড়ে যেতে চাস? চল।’

শিহাব নাবিলার হাত ধরে টান দিলো। নাবিলা আবার হাত ছাড়িয়ে নিলো। হয়তো মনে মনে বলছে, আমি যে বড় হয়েছি, ভাইয়ার এটা মনেই থাকে না। এখানে এত মানুষের সামনে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলে লোকজন কী ভাববে? আসলে কেউ কিছু ভাববে না। হাসপাতালে কে কার

হাত ধরলো, কে কাকে মাথায় নিলো, সেটা কেউ খেয়াল করে না। কেউ সর্বোচ্চ ভাবতে পারে, যার হাত ধরা হয়েছে, সে সম্ভবত রোগী।

হাসপাতালের উপরে কেন্টিন। সেখানে ওরা খেতে এলো। শিহাব জিজ্ঞেস করলো, ‘কী খাবি?’

‘আমি জানি?’

শিহাব কাউন্টারে জানতে চাইলো, ‘কী কী আছে?’

‘মুরগী, রুই মাছ, মুড়িঘণ্ট, সবজি।’

রেস্টুরেন্টে মুরগীর গোস্তু খেতে ভক্তি হয় না। ঢাকার কোনো মরা মুরগী না কি ভাগাড়ে যায় না; রেস্টুরেন্টের রান্না ঘরে যায়। রুই মাছ আর ডাল নিয়ে ওরা বসে গেলো।

নাবিলা খাচ্ছে খুব সংকোচের সাথে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এটা মনে হয় ঢাকার কোনো রেস্টুরেন্ট বা কেন্টিনে ওর প্রথম খাওয়া। ওরা গ্রামের বাড়িতে গেলে বাসা থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে যায়। ঘুরতে বের হলে দুপুরের খাবার খেয়ে বের হয়। যদি সকালের দিকে বের হয়, তাহলে বাসায় এসে খায়, তাতে তিনটা-চারটা যাই বাজুক। ওদের রেস্টুরেন্টে খাওয়ার মানে হলো ও অথবা ওর আক্কা যদি পুরি, সিঙ্গারা, মোগলাই নিয়ে আসেন, বাসায় বসে সেগুলো খাওয়া।

শিহাব বললো, ‘কী রে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস কেন খাওয়ার সময়? নিজের পাতের দিকে তাকিয়ে খা।’

নাবিলা নিজের পাতের দিকে তাকিয়ে খেতে থাকলো।

শিহাবের খাওয়া যখন শেষ, তখন নাবিলার পাতে অর্ধেক ভাত রয়ে গেছে। শিহাব বসে রইলো। নাবিলা বললো, ‘তুমি হাত ধুয়ে আসো। বসে থাকা লাগবে না।’

এটা শিহাবের অভ্যাস হয়ে গেছে। ওর আক্কা শিখিয়েছেন, কেউ যদি খাবারের দাওয়াত দেয়, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া আগেভাগে হাত ধুতে হয় না। এটা মানতে মানতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে—ও যেখানেই কারো সাথে খেতে বসে, নিজের খাওয়া আগে শেষ হলেও বসে থাকে।

নাবিলার খাওয়া শেষ হওয়ার পর আবার বললো, ‘আর কিছু খাবি? দই আছে মনে হয় এখানে। দই খাবি?’

নাবিলা মাথা নাড়লো।

খেয়ে এসে ওরা দেখলো ওদের মা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। ওদেরকেই মনে হয়ে খুঁজছিলেন। শিহাব এখন ভাবলো, এভাবে দুজন একসাথে যাওয়া উচিত হয়নি। ওর মা কি এই প্রথম হাসপাতালে ভর্তি হলেন? হতে পারে।

নাবিলা বললো, ‘মা, বাসায় যাবা? ডাক্তার বলেছে আমরা বাসায় যেতে পারি।’

রেহানা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, ‘চল।’

শিহাব জিজ্ঞেস করলো, ‘কিছু খাবা মা?’

‘না। বাসায় গিয়ে খাবো। ভাত-তরকারি কি সেই অবস্থায় আছে?’

‘তুমি এখনো তোমার ভাত-তরকারি নিয়ে ভাবছো? নাবিলা গুছিয়ে রেখে এসেছে মা। ডাক্তার বলেছেন তোমার শরীর দুর্বল। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি চিন্তা বেশি করো; এ জন্য তোমার শরীর কাহিল হয়ে যাচ্ছে।’ কী চিন্তা করে সেটা আর শিহাব বললো না। ওর মা চিন্তা করে, ছেলেটা কবে লেখাপড়া শেষ করবে? কবে একটা ভালো চাকরি পাবে? তাহলে পরিবারের এতটা গতি হবে। ওর আর কোনো ভাই নেই। থাকলে মনে হয় চিন্তাটা একটু কম হতো।

ভেবেছিলো হাসপাতালে যদি ভর্তি করাতে হয় তাহলে বিকালের দিকে ফোন দিয়ে ওর আব্বাকে হাসপাতালে আসতে বলবে। এখন আর সেটা দরকার নেই। দুই হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলো; সেটাও পুরো খরচ হয়নি। মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালো।

নাবিলা ওর মাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলো। এই ফাঁকে শিহাব ভেবে নিলো, মায়ের জন্য কী নেয়া যায়। বিষ ছাড়া ফল কী আছে? দেশী ফল আছে বিষ ছাড়া। সুপারশপগুলোতে না কি বিষ ছাড়া ফল পাওয়া যায়। আশেপাশে কি কোনো সুপারশপ আছে? আচ্ছা, হাসপাতালগুলো কেন্টিন চালায়; ওরা ওখানে ফল বিক্রি করতে পারে না? দেশী ফল তো নিজেরা বাগান থেকে নিয়ে আসবেই, বিদেশী ফলগুলো নিজেরাই আমদানি করবে; যাতে বিষ মেশানোর কোনো সুযোগ না থাকে। এই হাসপাতালে কি কোনো অভিযোগ-পরামর্শ বক্স আছে? ওর কাছে মনে হয় অভিযোগ-পরামর্শ বক্স একটা ভুয়া জিনিস। দেখা গেলো যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ, তার হাতেই বাকশের চাবি। তিনি সুন্দরমতো অভিযোগের চিঠি বের করে ছিঁড়ে ফিলবেন।

মাকে নিয়ে নাবিলা ফিরে আসার পর শিহাব বললো, ‘আমি একটু বাইরে থেকে আসি তাহলে। সিএনজি পাওয়া যায় কি না দেখি।’

বিকাল হয়ে গেছে। এখনো অনেক গরম। আষাঢ় মাসের গরম; সহজে যাবে না। আষাঢ় মাস কেন? এখন তো ঢাকা শহরে দশ মাসই গরম থাকে। গরমেও ওর মা কাহিল হয়ে যেতে পারে। মায়ের জন্য একটা চার্জার ফ্যান কিনলে কেমন হয়? মা তো আর একা বাতাস খাবে না, সাথে আব্বাও খাবেন। ও যে দোকানে কাজ করে, সেই দোকানের নিচেই ইলেক্ট্রিক মার্কেট। মোমেন ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চার্জার ফ্যান আনলে আস্তে আস্তে টাকা দেয়া যাবে মনে হয়। মোমেন ভাইয়ের সাথে ওর ভালো পরিচয় আছে। এমনিতে মার্কেটের মোটামুটি অনেকের সাথেই পরিচয় আছে। সবচেয়ে বেশি পরিচয় দোকান মালিক সমিতির কমিটির সাথে। কমিটির প্রত্যেক দিনই দু-একটা কম্পোজের কাজ থাকে। সমিতির ওফিশ থেকে পিওন এসে কাগজ দিয়ে যায়; টাইপ করার কর প্রিন্টআউটটা নিয়ে শিহাব নিজেই যায়। তখন কমিটির লোকেরা এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। বসিয়ে চা খাওয়ায়। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, শিহাব ছাড়া সমিতির কোনো বিষয় কম্পোজ হবে না। সমিতির সেক্রেটারির কথামতে, শিহাবের কম্পিউটারের হাতের লেখা খুব ভালো।

সেক্রেটারি আবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, ‘কম্পিউটারের হাতের লেখা ভালো মানে বুঝলেন না? শিহাব ভাই বুঝে কোনখানে কোন ডিজাইন দিতে হইবো। কোন ফন্ট হইবো; কত সাইজ হইবো। অন্য কেউ হ্যার মতো বুঝে না। সবাইরে দিয়া কি সব কাম হয়?’

সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদেরকে সব কাজ করতে হয়। পরিবারের একমাত্র ছেলে হলে সব কাজ করতে হয়। নাবিলা যখন কোলের বাচ্চা, শিহাব তখন ওর পেশাবের ত্যানা-কাঁথা ধুয়েছে। নাবিলার জন্মের পর কয়েক দিনের জন্য ওর ছোট খালা ছিলেন। খালা যাওয়ার পর থেকে ওর মাকে বাচ্চা কোলে নিয়েই ঘরের কাজগুলো করতে হয়েছে। ওর আব্বাও তখন ওর মাকে এগিয়ে দিতো। যেমন রাতে যে কাঁথাগুলো জমতো, সেগুলো ওর আব্বা ভোরে ধুয়ে দিয়ে যেতেন, যাতে ওর মায়ের ঠাণ্ডা না লাগে। সারা দিনের পেশাবের কাঁথাগুলো ও ধুতো। ওর মা জিজ্ঞেস করতো, তরকারি কুটতে পারবি? ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতো।

তরকারি কুটতে গিয়ে একেকটা একেক আকৃতির হয়ে যেতো। ওর মা কিছু বলতো না। সেগুলোকে কোনো রকম কষানো ছাড়া একবারে তেল-মরিচ দিয়ে বসিয়ে দিতো। ভাত চড়ানোর পর মা বলতো, পনেরো মিনিট পর এসে দেখবি বলক এসেছে কি না। যদি বলক আসে, তাহলে চুলা কমিয়ে দিবি। মাড় গালানোর জন্য ওর দু পায়ের উপর নাবিলাকে শুইয়ে দিয়ে ওর রান্না ঘরে যেতো। ঘরের এ কাজগুলো যেমন ওকে করতে হয়েছে, আবার বাইরের কাজগুলোও ওকে শিখতে হয়েছে। অনেকেই মনে করে একমাত্র ছেলে হলে সে আদরে থাকে। কথাটা ঠিক না। হয়তো বড়লোকের ছেলেরা থাকে। শিহাব বড়লোকের ছেলে না।

মাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকাল পার হয়ে গেলো। নাবিলা এমনিতেও গোসল করে মাগরিবের পর। এই সময়টাতে পুরুষেরা বাড়িতে থাকে না; মহিলারাও নামাজ শেষ করে বাচ্চাদের পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সকালে তো গোসল করা যায়ই না; দুপুরে বাথরুমে ঢুকলেও দেখা যায় বের হতে গিয়ে ছেলেদের মুখোমুখি হতে হয়।

সবুজের এক মামা আছে, এখানে থাকে। নাম হাতেম। পড়ে ক্লাশ এইটে। এইটে পড়লেও বয়স মনে হয় কুড়ির কাছাকাছি হবে। সেই ছেলে সব সময় মুখ হা করে থাকে। যার নাম হাতেম হবে, সে সবাইকে খাওয়াবে। কিন্তু এই ছেলে নিজেই হা করে থাকে। মনে হয় সে কিছু না কিছু খেতে চাইছে। নাবিলাকে দেখলে যে কোনো ছুতায় ওর সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করবে; ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে। দুপুরে যখন গোসল করতো, তখন বেশ কয়েক দিন সেই ছেলের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এরপর থেকে ও সন্ধ্যায় গোসল করা শুরু করেছে। সন্ধ্যা বেলা ছেলেটা আড্ডায় থাকে। কিন্তু দিন তিনেক ধরে মনে হচ্ছে হাতেম টের পেয়ে গেছে, ও সন্ধ্যা বেলা গোসল করে। গোসল করতে ঢুকে বাইরে হাতেমের ঘুরঘুর করার আওয়াজ শুনতে পায়। এখন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নাবিলা আজ গোসল করেছে না। অপেক্ষায় আছে হাতেমকে হাতেনাতে ধরার। নাবিলা বাথরুমে ঢোকার এক মিনিটের মাথায় কারেন্ট চলে গেছে। হাতেমের জন্য আরো সুবিধা হয়েছে। সে বাথরুমের খুব কাছে ঘুরঘুর করেছে। নাবিলা রাতের বেলা বাথরুমে এলে সব সময় টর্চ নিয়ে আসে। এখন ওর কাছে টর্চ আছে। কিন্তু টর্চ জ্বালায়নি।

দরজার ছিটকিনি নিঃশব্দে খুললো। এরপর ধড়াম করে দরজা মেললো। হাতেমের গায়ে দরজার বাড়ি লেগেছে। দরজা খুলেই সাথে সাথে টর্চ জ্বালালো।

‘কী হাতেম? তুমি কি বাথরুমে যাবা?’

হাতেম বয়সে নাবিলার বড় হলেও কিছু করার নেই। ও পড়ে ক্লাশ এইটে। নাবিলার তিন ক্লাশ নিচে। আর একে আপনি করে বললে এ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

হাতেম হা করে রইলো।

‘পুরুষ মানুষ বাথরুমে যেতে চাইলে গলা খাকাড়ি দিয়ে আসে, তা তুমি জানো না?’

হাতেম হা।

‘যাও, তুমি বাথরুমে যেতে চাইলে যাও। হা করে আছো কেন? যাও। ভয় করছে? আমি টর্চ ধরবো? ছোটরা বাথরুম করতে গেলে বড়রা বাইরে থেকে টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। যাও, আমি টর্চ ধরে আছি।’

হাতেম মাথা নিচু করে চলে যেতে লাগলো।

নাবিলা বললো, ‘আচ্ছা, আমি তোমার আপাকে ডাক দিয়ে বলছি, তুমি বাথরুমে যেতে ভয় পাচ্ছে। উনি এসে টর্চ ধরুক, না কি?’

হাতেম গতি বাড়িয়ে দিলো। ঘরে আর ঢুকলো না। গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলো। বের হওয়ার সাথে সাথে দৌড়ের আওয়াজ শোনা গেলো। ওকে বলা উচিত ছিলো, ব্যথা বেশি পাওনি তো?

এখন থেকে গোসল করতে এলে মাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। এতেও কিছুটা বামেলা হতে পারে। অন্য ভাড়াটিয়ারা এটা নিয়ে টিপ্পনি কাটতে পারে। ও কালো বলে কথা আরো বেশি হতে পারে। সবুজের মা হয়তো বলে ফেলবে, ‘কী যে ওনার রূপ বেয়ে পড়ে—সেটা দেখার জন্য মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!’ এ সব বামেলা হলেও কিছু করার নেই। মাকে কি বিষয়টা বলবে? মনে হয় বলার দরকার নেই। মাকে যদি গোসল করার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, মা এমনিতেই বুঝবে।

নাবিলা খুব দ্রুত গায়ে পানি ঢালতে লাগলো। মেয়েদের এমন কোনো প্রতিযোগিতা যদি হয় যে, কে সবচেয়ে কম সময়ে গোসল করতে পারে,

তাহলে নাবিলার প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনিতে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে ওর গোসল শেষ হয়ে যায়। আজ মনে হয় চার মিনিটে শেষ হয়েছে।

সন্ধ্যায় গোসল করার একটা সমস্যা হলো কাপড় শুকানো। খাটের স্ট্যান্ডের সাথে সারা রাত কাপড় মেলে দেয়া থাকবে; কিন্তু শুকাবে না। সকালে আবার রোদে মেলে দিতে হবে। খাটের স্ট্যান্ডে মেলে দেয়ার সময় চার দিকে মেলে দেয়া যাবে না। দেয়ালের দিকে দিতে হবে। অন্য দিকে দিলে নাকে লাগবে। কাপড় মেলে দিয়ে ও মায়ের কাছে গেলো। মায়ের পাশে শিহাব বসা আছে। নাবিলা গিয়ে প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে বসলো। ওদের বাসায় মোট চারটা প্লাস্টিকের চেয়ার। আগে কাঠের চেয়ার ছিলো। কিন্তু এ রকম বাসায় কাঠের চেয়ার দুটোর বেশি রাখা যায় না। প্লাস্টিকের চেয়ার যত খুশি রাখা সম্ভব। নাবিলা ওর মাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘মা, এখন কেমন লাগছে?’

‘ভালো। তোর ভাইয়াকে কিছু দে।’

শিহাব বললো, ‘মা, তোমার এটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। আমরা তো খেয়েছি তিন ঘণ্টাও হয়নি। এখন খিদা লাগেনি। তোমার কোনো কাজবাজ করা লাগবে না কয়েক দিন। নাবিলা রান্নাবান্না করুক। কী রে, পারবি না?’

‘পারবো না কেন? ভাতের সাথে আলু সিদ্ধ দেবো। অথবা তরকারি আলাদা রান্না না করে একবারে সব কিছু মিলিয়ে খিচুড়ি চড়িয়ে দেবো।’

নাবিলার কথা শেষ হতে না হতে ওদের আবার গলা খাকাড়ি শোনা গেলো। তিনি ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন, ‘কী হয়েছে?’

শিহাব বললো, ‘মা একটু মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গিয়েছিলো।’

‘সেলাইন লাগিয়েছে কে?’

‘হাসপাতালে নিয়েছিলাম।’

‘এত কিছু হলো, আমাকে জানানো না?’

‘আমরা হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকিনি। ঘণ্টাখানেক ছিলাম। ডাক্তার বলেছে কোনো সমস্যা নেই। শরীর দুর্বল। ভালো ভালো খাওয়াতে।’

নিজামুদ্দিন সামনের বারান্দায় গিয়ে প্যান্ট পাণ্টে লুঙ্গি পরে এলেন। শার্টও খুলে ফ্যানের নিচে দিয়ে এসেছেন। শিহাব একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। সেটাতে বসতে বসতে তিনি বললেন, ‘ঘটনা কখনকার?’

‘দুপুরের আগে আগে। নাবিলা জানালো।’

‘দুপুরের ঘটনা, এখন বাজে সাতটার বেশি। আমি কিছুই জানলাম না!’

সালেহা দুর্বল কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি শুনলে কোথায় আসতে? বাসায় এসে কাউকে পেতা না। হাসপাতালেও আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না।’

‘আমি তো আসার কথা বলছি না। জানার কথা বলছি।’

‘জানলে কি তুমি বসে থাকতা?’

নিজামুদ্দিন কোনো জবাব দিলেন না। নাবিলা উঠে গেলো চা চড়ানোর জন্য। রান্না ঘরে আসার আগে সর্ষে তেল দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে দিয়ে এলে ভালো হতো। ওদের বাসায় সারা বছর বরিশালের মোটা চাউলের মুড়ি থাকে। ওর আক্বা বাড়িতে গেলে নিয়ে আসেন।

মুড়ির চেয়ে চাউল ভাজা দিয়ে চা খেতে বেশি মজা। ঘরে আউশ চাউলও থাকে প্রায় সব সময়। এটাও বাড়ি থেকে আসে। বাড়ি থেকে আসে বলতে বরিশাল থেকে কিনে আনা হয়। দাদী যত দিন বেঁচে ছিলো, ওরা গেলে চাচাতো ভাইগুলোকে গাছে উঠিয়ে নারিকেল পাড়াতো। দাদী নিজের হাতে চাল ভাজতো; ওরা নারিকেলের সাথে চাল ভাজা খেতো। ঢাকায় এখন একটা ভালো নারিকেলের দাম একশো টাকার মতো।

দুধ চায়ের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে রং চা বানাতে হয়। সামান্য পরিমাণ চা পাতা দিয়ে পানি গরম করতে হয়। সেই সামান্য চা পাতা যখন রং হয়ে আসে, তখন চা উঠাতে হয়। চায়ের রং সুন্দর হয়েছে। নাবিলার নিজেরই দেখে ভালো লাগছে। ওর বানানো চা খেয়ে কেউ প্রশংসা না করলে ওর খুব খারাপ লাগে। ওর আক্বা এটা জানেন। সে জন্য ওর আক্বা সব সময় বলেন, ‘চা খুব সুন্দর হয়েছে।’ সব সময় নিশ্চয়ই সুন্দর হয় না। কিন্তু তারপরও এটা শুনতে ভালো লাগে। আর ওর ভাইয়া কখনোই বলবে না চা ভালো হয়েছে। চা কেমন হলো জানতে চাইলে বলবে, ‘চা বানিয়েছিস, খেয়েছি। কেমন হয়েছে আবার বলতে হবে কেন? আমি এত প্রশংসা করতে পারবো না। বিয়ের পর জামাইকে চা বানিয়ে খাওয়াস আর তার কাছ থেকে প্রশংসা শুনিস।’

নিজামুদ্দিন তার স্ত্রীকে বললেন, ‘তুমিও চা খাবা না কি? চা খেলেও দুর্বলতা কেটে যায়। সেলাইন তো আছেই। দ্বিগুণ শক্তি। তাড়াতাড়ি গায়ে বল ফিরে পাবা।’

শিহাব বললো, ‘মা, আব্বা কিন্তু খারাপ বলেননি।’

‘তোরা খা। সেলাইন শেষ হলে আমি ভাত খাবো।’

নাবিলার এখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে, ‘মা, তোমার কি কুতকুত খেলতে মন চায়? আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন কুতকুত খেলতে মন চায়।’ কিন্তু কথাটা এখন জিজ্ঞেস করা যাবে না। ওর মায়ের সাথে ওর অন্য রকম একটা সম্পর্ক আছে, যেটা শুধু ওরা দুজন জানে। সেখানে অনেক গোপনীয় কথাবার্তা হয়। বাসায় যখন অন্য কেউ থাকবে না, তখন সে সব কথাবার্তা হবে। এখন ওকে রান্না চড়াতে হবে। আগামীকাল খালারা আসতে পারেন। ওর মা নিশ্চয়ই বলবেন তার বোনদেরকে জানাতে। একজন বোনকে জানালেই চলবে। বাকিরা একসাথে চলে আসবে। এসেই কতক্ষণ গলা ধরে কাঁদবে সবাই মিলে। তারপর যে হা হা হি হি শুরু হবে, সারা দিন চলতে থাকবে। নাবিলার একটা সুবিধা হবে। ওকে রান্না করতে হবে না। খালারাই রান্না করবে।

ভাত চড়িয়ে এসে শিহাবকে সামনের রুমে ডাক দিলো নাবিলা। মা-বাপের সামনে বললেও চলতো। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে ওদের আব্বা শুনলে মনে মনে কষ্ট পেতে পারেন। শিহাব এলে বললো, ‘ভাইয়া, কাল সকালে বাজারে যেও তো।’

‘কেন?’

‘কেন জানো না? খালারা আসবে কালকে। তোমাকে মা এখনো বলার সুযোগ পায়নি। অপেক্ষা করো, বলবে।’

শিহাব অনেক কিছুই এখন কেনে। বাসা থেকে বললে কেনে; না বললেও আসার পথে চোখে ভালো লাগলে এটা-ওটা কিনে নিয়ে আসে।

শিহাব বললো, ‘আচ্ছা, কালকেরটা কালকে দেখা যাবে। শোন, তুই এক কাজ করবি। আগামীকাল ফালানীর মায়ের কাছে যাবি। বলবি আমাদের বাসায় এক পোয়া করে দুধ দিতে। মা দুধ খাক রোজ। কী বলিস?’

‘আচ্ছা।’

৯

অসুস্থ হলেন সালেহা, মারা গেলেন নিজামুদ্দিন।

দুপুরে খাওয়ার পর কেবল তিনি টেবিলে এসে বসেছেন। এর মধ্যে মেসেঞ্জার প্রত্যেকের টেবিলে কিছু কাগজ দিয়ে গেছে। নিজামুদ্দিন কাগজের দিকে চোখ বুলালেন। প্রথমটা নোটিশ। আগামীকাল থেকে দুপুর বেলা ওফিশে বসে ভাত খাওয়া যাবে না। এ রকম একটা নিয়ম হবে হবে বলে বেশ কিছু দিন যাবত শোনা যাচ্ছিলো। ভাত খেলে লোকজনের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে, কাজে ব্যাঘাত ঘটে। খেতেও সময় বেশি লাগে। এমডি সাহেব হয়তো হিসাব করেছেন, ওফিশে মোট সাতাশজন লোক। ভাত খাওয়ার পিছনে পাঁচ মিনিট আর ঘুম ঘুম ভাবের কারণে পনেরো মিনিট করে সময় নষ্ট হলে প্রতি দিন পাঁচশো চল্লিশ মিনিট করে কর্ম ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, যা একজন লোকের প্রায় তিন দিনের মোট কাজের সমান। মালিক পক্ষের কাছে হিসাবটা দিয়ে তিনি বলতে পারেন, আমরা তিনজন লোককে খুব সহজেই ছাটাই করে দিতে পারি।

‘সালেহার তো এখন তাহলে কষ্ট হয়ে যাবে। ভাত রান্না করতে হবে; রুটিও বানাতে হবে।’ নিজামুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন।

দ্বিতীয়টা একটা অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম। কোম্পানি নতুন একটা ব্যাংকে এখন থেকে লেনদেন করবে। কর্মচারীদের সবার অ্যাকাউন্টও সেখানে খুলতে হবে। এক বছরে দেশে দশটা নতুন ব্যাংক হয়ে গেলো। গিনেস বইয়ে এ জন্য বাংলাদেশের নাম ওঠার কথা। নতুন ব্যাংকগুলো কাস্টমার পাওয়ার জন্য হন্য হয়ে ঘুরছে। তাদের কোম্পানি নতুন কোনো ব্যাংকের পাওয়া পড়েছে? না কি মালিক পক্ষের কেউ নতুন ব্যাংকেরও মালিক? তাহলে খুব সহজে বিনিয়োগ পাওয়া যাবে; ব্যবসা বাড়বে। খারাপ না। এদের যদি ব্যবসা বাড়ে, নতুন কোনো কোম্পানি খোলে, তাহলে শিহাবকে বলা যাবে সেখানে চাকরির দরখাস্ত করার জন্য।

লোকমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ‘নিজাম ভাই, আমার বাপের নাম একটু বলেন তো।’

লোকমান সাহেবের যখন ডায়াবেটিস বেশি থাকে, তখন তার মাথা কোনো

কাজ করে না। নিজের বাপের নামও ভুলে যান। অ্যাকাউন্ট খোলার ফরমে পিতার নাম লিখতে গিয়ে সম্ভবত মনে করতে পারছেন না।

নিজামুদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাবীর নাম মনে আছে?’

‘ওটা তো এখনো আসেনি। এখন পিতার নামের ঘরে আছি।’

‘আচ্ছা, আপনার পিতার নাম হলো জাহেরুল সর্দার। আপনার তো ভাই মহা সমস্যা। ছোট বেলা শুনতাম কেউ কোনো অপরাধ করলে বড়রা বলতো, বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো। আপনি কেন বাপের নাম ভুললেন? আপনি কী অপরাধ করেছেন?’

‘আপনি তো জানেন ভাই, আমার চাকরিটা থার্ড ক্লাশ হতে পারে; আমি মানুষটা কিন্তু থার্ড ক্লাশ না। মানুষ এক নম্বর। আমি কোনো অন্যায় কাজ করি না।’

‘হ্যাঁ, তা তো আপনার রোগ থেকেই বোঝা যায়। ডায়াবেটিস হলো এখন দেশের এক নম্বর রোগ। আপনি এক নম্বর লোক বলেই আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে। কিন্তু কথা সেটা না। আমার চিন্তা লাগছে, আপনি আবার কোন দিন বাসার ঠিকানা ভুলে যান। দেখা যাবে সারা রাত আপনার বাড়ির কাছাকাছিই ঘুরছেন; কিন্তু বাসায় যেতে পারছেন না।’

‘হতেও পারে। এক কাজ করলে কেমন হয়? আপনার এলাকায় বাসা নিলাম। একসাথে গেলাম; একসাথে এলাম।’

‘আসতে পারেন। কিন্তু আগে ভাবীর কাছ থেকে অনুমতি নেন।’

‘এখানেই তো সমস্যা। মেয়ে মানুষের সামনে ভবিষ্যতের কোনো কথা বলতে গেলে তারা সামনে শুধু সমস্যা আর বিপদ দেখে। আমি যদি বাসা পাল্টানোর কথা বলি, প্রথমেই চিন্তা করবে এর পিছনে কী কারণ আছে? তার স্বামী কারো সাথে লটরপটর করছে না তো? কল্পনায় সে এটা দেখেও ফেলবে, আরেকজন মহিলার সাথে তার স্বামী মাখামাখি করছে। এ গেলো এক দিক। আরেক দিক হলো, এত দিন একটা এলাকায় থাকতে থাকতে তার বিশাল এক বান্ধবী গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এদেরকে ছেড়ে যেতে সে চাইবে না।’

‘মেয়েরা এটা খুব সহজেই পারে। এটা তাদের কাছে কোনো বিষয়ই না। মেয়েরা বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বশুর বাড়ি চলে যায়; স্বশুর বাড়িতে কিছু দিন থাকার পরে আবার ঝগড়াঝাটি করে আলাদা হয়। আলাদা হওয়াতেই

মেয়েদের আনন্দ। মেয়েদের মাধ্যমে নতুন জন্ম হয়। নতুন জন্ম মানে কী? এত দিন যার সাথে সরাসরি সম্পর্ক ছিলো তা ছিন্ন করে দাও।’

‘আচ্ছা, বাসায় তাহলে বলে দেখি বাসা বদলানোর কথা।’

নিজামুদ্দিন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এতটা আগানো উচিত হয়নি। লোকমান সাহেব যদি সত্যি সত্যিই তার এলাকায় চলে আসেন, তাহলে অনেক সমস্যা আছে। লোকমান সাহেব হয়তো বাজারে যাওয়ার সময় তাকে ডাকলেন। একসাথে গিয়ে দেখা যাবে দুজনের বাজার ভিন্ন। তখন তিনি বাসায় বলবেন, এক বাটি তরকারি নিজাম ভাইর বাসায় দিয়ে আসো। লোকমান সাহেবের বাসা থেকে যদি তরকারির বাটি আসে, সেটা কি খালি পাঠানো যাবে? সেই বাটি ফেরত পাঠানোর জন্য দেখা যাবে আবার কিছু কিনতে হবে।

তাহলে এখন উপায় কী? উনি যদি বাসা খুঁজতে বলেন, গুরুত্ব দিয়ে খোঁজা যাবে না। কোনো বাসার কথা জানা থাকলেও সেটার ভালো দিক বাদ দিয়ে খারাপ দিকগুলো বলতে হবে। কিছু বৈশিষ্ট্য ঢাকার প্রায় সব বাড়িওয়ালার মধ্যে আছে। সেগুলো যোগ করা যেতে পারে। সেগুলো কী কী? নিজামুদ্দিন ভাবতে শুরু করলেন।

কিন্তু তিনি ভাবতে পারছেন না। চোখের সামনে সব কিছু আবছা দেখছেন। লোকমান সাহেবকে ডাক দিলেন, ‘লোকমান ভাই, ভূমিকম্প হচ্ছে না কি?’

‘কই, না তো। গত সপ্তাহের ভূমিকম্পটা মনে হয় আপনার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। আরো দুবার আপনি ভূমিকম্পের কথা বলেছেন। চলেন, নিচে গিয়ে চা খেয়ে আসি। মাথা থেকে ভূমিকম্প চলে যাবে...।’

লোকমান সাহেবের কথা এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে কেন? তিনি কি পড়ে যাচ্ছেন? অনেক উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন মনে হয়। চোখের সামনে পুরো অন্ধকার হয়ে আসছে। লোকমান সাহেবকে ডাক দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তিনি কোথায় পড়ে যাচ্ছেন?

তিনি মারা গেলেন চেয়ারের উপরে। তারপরও তাকে ওফিশের পক্ষ থেকে হাসপাতালে নেয়া হয়। লোকমান সাহেব সব সময় সাথে ছিলেন। শিহাবকে তিনিই ফোন করেন। শিহাব ফোন ধরার পর চাপা গলায় তিনি বললেন, ‘তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো হাসপাতালে চলে আসো। তোমার আবার

অবস্থা ভালো না। হাসপাতালে এসে আমাকে ফোন দিও।’

শিহাব বুঝতে পারেনি যে, ওর আবার অবস্থা ভালো না মানে তিনি মারা গেছেন। ও হাসপাতালে চলে গেলো। যাওয়ার পর লোকমান সাহেব বললেন, ‘বাসায় কি কিছু জানিয়েছো?’

‘না তো।’

তিনি ওর মুখের দিকে তাকালেন। ওর নির্বুদ্ধিতা অথবা অপরিপক্বতা কি মেপে দেখলেন? কিছু না বলে ওকে নিয়ে তিনি কেবিনে গেলেন। শিহাবের কাছে তখন নিজেকে একটা জরাজীর্ণ দালানের মতো মনে হলো। দালানের পলেস্তরা খসে পড়ছে; ইটগুলোও একটার উপর আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। দালানটা মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেলো। ওর আব্বা মৃত্যুর আগে চোখের সামনে যে ভূমিকম্পটা দেখেছিলেন, ও ঠিক সে রকম ভূমিকম্প দেখতে পেলো। পিতা থেকে পুত্রতে ভূমিকম্প চলে এলো। অথচ এ বিষয়ে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো যোগাযোগ ছিলো না।

লোকমান সাহেব কখন এসে যে ওর হাত ধরেছেন, ও টের পায়নি। ও কেন যেন কেবিনের মাঝখানে দাঁড়ানো ছিলো, সেখান থেকে আর নড়তে পারছিলো না। লোকমান সাহেব ওকে ধরে নিয়ে গেলেন বিছানার কাছে। ও ওর আব্বার হাত ধরে দেখতে লাগলো; গাল ধরে দেখতে লাগলো; পা ধরে দেখতে লাগলো। ওর কণ্ঠনালী এ রকম আটকে আসছে কেন? ও কি বোবা হয়ে যাচ্ছে? এ রকমই মনে হচ্ছিলো তখন।

বাসায় আসার পর মা আর বোনের কান্না দেখে কাঁদতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি। কথার সাথে কি ওর কান্নাও বন্ধ হয়ে গেছে? আর কোনো দিন কাঁদতে পারবে না?

বন্ধুদের কাউকে কিছু না বললেও সবাই এসে হাজির হয়েছে। কে খবর দিয়েছে কে জানে। লোকমান আংকেল ঘণ্টা দেড়েক থেকে রাত সাড়ে বারোটার দিকে চলে গেছেন। আগামীকাল আবার আসবেন বলে গেছেন। যাওয়ার সময় ওর বন্ধুদেরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলে গেছেন, ‘ওর সাথে তোমরা কথা বলো। কথা বলে ওকে কাঁদানোর চেষ্টা করো। কাঁদলে হালকা হবে।’

শিহাব তো কাঁদতে চায়। কিন্তু কাঁদতেও পারছে না।

আপনজন মারা গেলে তার স্মৃতি মনে করে করে মানুষ কাঁদে। এখানেও ওর

বেলায় উল্টো ঘটনা ঘটছে। স্মৃতির বদলে ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় আসছে। ও যে চাকরিটা করে তা দিয়ে মা-বোনকে চালানো যাবে না। এই সপ্তাহের মধ্যেই একটা মোটামুটি বেতনের চাকরিতে লেগে যেতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো টেক্সটাইলে ঢুকে যাওয়া। গার্মেন্টস-টেক্সটাইলে ভালোই বেতন পাওয়া যায় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে। এ সব জায়গায় লোকের চাহিদাও থাকে সব সময়। কিন্তু মানুষজন সাধারণত মনে করে গার্মেন্টস মানেই মহিলা শ্রমিক; আর তাদের কাজ শুধু সেলাই করা। গার্মেন্টসের পিছনে যে টেক্সটাইল-ডাইং-উইভিং-ফিনিশিং-সাইজিং-ব্লিচিং আছে, সে সব কথা অনেক মানুষই জানে না। যেমনটা ফিলিং স্টেশনের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা হলো, এগুলোর চাকরি মানেই নজেলম্যান। এর পিছনে যে ইঞ্জিনিয়ারও কাজ করে, সে খবর কজন জানে?

বাবা মারা যাওয়ার পরপরই মানুষের মধ্যে এ সব চিন্তা চলে আসে? ওর কান্নাকাটির দ্বিতীয়-তৃতীয় ধাপ চলে গেছে আরো আগে। কান্না কি আর আসবে না? এখন বাজে সকাল সাতটা। সাড়ে সাতটায় জানাজার সময় দেয়া আছে। কবর খোঁড়া শেষ হওয়ার খবরও চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশ নিয়ে রওনা হতে হবে। ওর কাঁধেও থাকবে একটা কোনা। সাথে আরো একজন থাকতে পারে—শোকের কারণে ধরে রাখতে পারে কি না, সেই চিন্তায়।

পিতৃকুল থেকে ঢাকায় ওদের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। বাড়িতে খবর দেয়া হয়েছিলো। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে ওর চাচা বলেছেন, ‘দাফন কি শেষ করে ফেলেছিস?’ ওর আব্বার কাছে কারো কোনো ঋণ নেই। এ দিক থেকেও ও চিন্তামুক্ত। তাহলে আর অপেক্ষা কেন? ও বরং প্রস্তুত হয়েই বসে আছে। লাশের খাট ধরতে বলার সাথে সাথে ও উঠে দাঁড়াবে। ওর এখন কোনো কাজ নেই। মহল্লায় কিছু লোক আছে, যারা কেউ মারা গেলে নিজের গরজেই লাশের গোসল, বাঁশ-চাটাই-আতর-সাবান-কর্পুর আর কাফনের কাপড় কেনা, মসজিদ থেকে খাট নিয়ে আসা, খোস্তা-কোদাল-শাবল জোগাড় করে কবর খোঁড়া—সব কাজ করে। এরা রিকশা চালক, রাজমিস্ত্রি, তরকারি বিক্রেতা—এই ধরনের লোক, যারা তাদের কাজ থেকে ছুটি নিলেই আয়-রোজগার কমে যায়। অন্য দিকে যারা ব্যবসায়ী, ইচ্ছা করলেই কর্মচারীকে বসিয়ে চলে আসতে পারে; কিংবা যারা চাকরি করে, এক দিন বা এক বেলা

ছুটি নিলে বেতন কাটা হবে না, তাদের কেউ এই কাজগুলো করে না। শিহাবও জানে না, স্বল্প আয়ের লোকগুলো কেন এ সব কাজ করে। এরা আওয়ামী লীগ বা বিএনপির নেতাও না যে, ভোটের সময় এই পুণ্য কাজ কাজে আসবে। নাসের চাচা এদের সব কিছুই তদারকি করেছেন আর কিছুক্ষণ পরপর এসে ওকে বলছেন, ‘বাবা শিহাব, এভাবে বসে না থেকে একটু ওঠো। ভেতরে তোমার মা-বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে আসো গিয়ে। তুমি তো পুরুষ মানুষ। যাও বাবা।’ এই কথার সময় ও বাবা মুখ নিয়ে নাসের চাচার দিকে তাকায়।

নাসের চাচা যে আছেন, শিহাবের ধারণা—উনি আছেন চক্ষু লজ্জার কারণে অথবা তার মেয়ের অনুরোধে। তার মেয়ে যার-তার মুখের উপর কথা বলে দিতে পারে। হয়তো সে বলেছে, আবু, আমার সাথে চলো। নাবিলার আব্বা মারা গেছে, সব কাজ তুমি করবা। আমিও যাচ্ছি ওকে সান্ত্বনা দিতে।

নাসের চাচা সিঁহিয়ার আবু। তিনি নিজেই এসে তার পরিচয় দিয়েছেন। শিহাবের কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, ‘আমার নাম নাসের। সিঁহিয়ার আবু। তোমার বোনের বান্ধবী সিঁহিয়া।’

শিহাব ঘাড় ঘুরাতে চাইলে তিনি বললেন, ‘তুমি বরং বসে থাকো। চা আনাচ্ছি। বসে চা খাও। সারা রাত জেগে থেকেছো, তোমার চা খাওয়া দরকার। তোমার বন্ধুদেরকেও বলছি। চায়ের সাথে বন রুটিও আনাচ্ছি। রুটি দিয়ে ভিজিয়ে চা খাও।’

নাসের চাচা কথা বলছেন, এর মধ্যে ওর মেঝো খালু দাঁড়ালেন। তার হাতে সিগারেট। তিনি সচ্ছন্দেই সেটা টানছেন। নাসের চাচার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলেন।

‘আমি আবু তালেব। শিহাবের মেঝো খালু।’

‘আমার নাম নাসের। শিহাবের বোন আমার মেয়ের বান্ধবী। কাছেই বাড়ি।’

‘আমিও বেশি দূরে থাকি না। সাঁতারকূলে। ছোটখাটো একটা ব্যবসা আছে। ওখানেই।’

শিহাব বেশি ভাবছে নাবিলাকে নিয়ে। বাপ মরা মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে যে কুসংস্কার আছে আমাদের সমাজে, পুরোপুরি দূর হতে আরো দুই প্রজন্ম লেগে যাবে। এর উপর নাবিলা কালো মেয়ে।

ওর মনে পড়ে, গিয়াসের আঝা যে দিন মারা গেলো, সে দিন গিয়াসের মা'র কাছে কিছু মহিলা এসেছিলো, যারা কেবল গিয়াসের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। গিয়াসদের পরিবার কীভাবে চলবে না চলবে সেটা তাদের আলোচনার বিষয় ছিলো না। তাদের দুশ্চিন্তা ছিলো গিয়াসের বোনকে নিয়ে। 'লোকটা তার মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলো না। এখন কী হবে আপা বলেন তো।'

'আমিও সেটাই ভাবছি।'

'মেয়ে তো ডাঙ্গর হয়েই গেছে। কোনো প্রস্তাব কি আসেনি মনে করেছেন? হয়তো তাদের বড় আশা ছিলো, সে জন্য মেয়েকে বিয়ে দেয়নি।'

'আমিও তো একটা প্রস্তাব দেবো দেবো করে ভেবে রেখেছিলাম। আমার এক খালাতো বোনের ছেলে সিএ করে একটা ব্যাংকে বড় পোস্টে ঢুকেছে। কিন্তু ছেলের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। মা যা পছন্দ করবে, তাই সই। বোন বলেছে ঢাকায় বাড়ি থাকলেও হবে, না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বেশি আধুনিক মেয়ে উনি চান না। সে কারণে ভেবেছিলাম প্রস্তাবটা দেবো। এখন কি আর সেটা সম্ভব?'

কবরে লাশ রাখার পর শিহাব বসেই ছিলো। শেষ পর্যায়ে ওর হাতে একজন মাটি তুলে দিয়ে বললো, 'দাও বাবা, দাও।'

বাচ্চারা যেভাবে নিজের হাতের মধ্যে তার খেলনা আঁকড়ে ধরে রাখে, শিহাবের হাতের মধ্যে মাটির ঢাকা তেমনি মনে হলো আটকে আছে। যিনি ওর হাতে মাটি তুলে দিয়েছিলেন তিনিই আবার ওর হাতটা সামনের দিকে নিয়ে ঝাড়া দিলেন। ছোট বেলা ও ওর আঝার সাথে গাছের বিচি বুনতো। তখন ওদের ভাড়া বাসার সামনে-পিছনে অনেক জায়গা ছিলো। ওরা তাতে সবজি চাষ করতো। লাউ, করলা, চিচিঙ্গা, শিম, পুঁই শাক—ঘুরেফিরে এগুলো লাগাতো। ওর আঝা বাজার থেকে বিচি এনে পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন। পরের দিন সেই বিচি লাগাতে যেতেন। ও গিয়ে পাশে বসে থাকতো।

'লাগাবি?' ওর আঝা জানতে চাইতো।

ও কিছু বলতো না।

ওর আঝাই তখন ওর হাতে একটা বিচি তুলে দিতেন। এরপর একটা জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে অবস্থান তৈরি করে বলতেন, 'এখানে রাখ।'

আজো মনে হচ্ছে সে রকম একটা বিচি বুনে দিলো। এই বিচিটা একদিন লতা গাছ হয়ে বাড়তে থাকবে। তারপর একদিন নিজেই শুকিয়ে যাবে।

কিন্তু গাছটা কখন গজাবে? কখন ওর দুঃখ জেগে উঠবে? আদৌ কি গাছটা গজাবে? না কি মাটির নিচেই ধ্বংস হয়ে যাবে?

বাসায় ঢোকার তিন-চার মিনিট আগে শিহাব হুঁশ হারিয়ে ফেললো। বন্ধুরা সাথে ছিলো। সাথে ছিলো বলতে ওকে সবাই ঘিরে ধরে আসছিলো। দুজনের হাত ছিলো ওর কাঁধে। সে কারণে রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথা ফাটানো থেকে বেঁচে গেছে।

১০

সিহ্নিয়ার চিকন নুডুলস পাওয়া গেছে। সেমাইর মতো চিকন নুডুলস বের হয়েছে এখন। মহল্লার দোকানে সেগুলো রাখে না। অবশ্য মহল্লার দোকানে কোনো জিনিশ না পাওয়া গেলে সমস্যা নেই। জালাল কাকুককে বললেই হয়। উনি সেটা হাজির করবেন। মোটা নুডুলসের কথা জালাল কাকুককে বলা হয়েছে গতকাল। উনি আজ সকালে সেটা নিয়ে এসেছেন। সিহ্নিয়া এখন সেই নুডুলস রান্না করছে।

আজ নাবিলা গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে আসবে। সে জন্য নুডুলস রান্না করা। নাবিলার আব্বা মারা না গেলে আরো আগেই শেখা শুরু হতো। সিহ্নিয়া যখন চিন্তা করলো নাবিলার সাথে সম্পর্ক বাড়াবে, তারপর থেকেই ওর উপর দিয়ে একটার পর একটা বিপদ যাচ্ছে। ওর মা অসুস্থ হয়ে পড়লো; আব্বা মারা গেলো। নাবিলার মা যখন অসুস্থ হয়, তখন সিহ্নিয়া ওদের বাসায়। দুজনের মাথায় কোনো বুদ্ধি এলো না। নাবিলা তো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। সিহ্নিয়ার নিজেরও কান্না চলে এলো। কিন্তু নাবিলার মতো অত বেশি না। নাবিলার কান্নাকাটি শুনে পাশের ভাড়াটিয়ারা চলে এলো। ওদের বাড়িওয়ালীও এলো। সবাই মিলে নাবিলার আশ্রুকে ধরাধরি করে খাটে নিয়ে শুইয়ে দিলো। বাড়িওয়ালীই প্রথম নাবিলাকে বললো ওর

ভাইয়াকে ফোন করার জন্য। ওর ভাইয়া এলো। সিঙ্হিয়ার যাওয়া সার্থক হলো। কেমন স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে না? স্বার্থপরের মতো শোনা গেলেও এটাই তো বাস্তব। ওর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো নাবিলার ভাইয়াকে দেখা। নাবিলার ভাইয়ার চেহারা নাবিলার মতোই ধারালো। ছেলেদের চোখ সাধারণত এত পরিষ্কার থাকে না, যতটা তার চোখ পরিষ্কার। চুলগুলোও কুচকুচে কালো। আজকাল কালো চুলের ছেলে তো দূরের কথা, মেয়েও পাওয়া যায় খুব কম। শরীরটা অবশ্য হ্যাংলাপাতলা। সিঙ্হিয়া যে নাবিলার পাশে বসে ওর মাকে বাতাস করছে বা পানির ছিটা দিচ্ছে, সে দিকে উনি কোনো নজরও দিলেন না। একবার জানতেও চাইলেন না মেয়েটা কে। ওনার মাকে নিয়ে যাওয়ার সময় নাবিলা বললো, ‘সিঙ্হিয়া, তুমি তাহলে যাও কলেজে।’

পরে কি কোনো সময় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মেয়েটা কে? নাবিলার আব্বা মারা যাওয়ার পরের দিনও সিঙ্হিয়া গিয়েছিলো ওদের বাসায়। সে দিন অবশ্য সিঙ্হিয়া কোনো কথা বলেনি। নাবিলাকে কী বলে সাজ্জনা দেয়া যায়, তা মাথায আসছিলো না। নাবিলা ওর কাঁধে মাথা রেখে কেঁদেছিলো; ও মাথাটা ধরে রেখেছিলো। এটুকুই। সে দিন আবার নাবিলার মা’র বদলে ওর ভাইয়া বিছানায় শোয়া ছিলেন।

নাবিলা ঢুকেই বললো, ‘আজ না সিঙ্হিয়া। কাল থেকে শুরু করবো।’

‘আচ্ছা, থাক তাহলে। এসো, আমরা আজ নিজেদের কথা বলি।’

‘নিজেদের কথা আর কী। আমার সব কিছুই তো তোমার জানা হয়ে গেছে।’

‘দু দিন কারো বাসায় গেলেই কি সব জানা হয়ে যায়? তোমার মা’র অবস্থা কী এখন?’

‘আছে। সুস্থ আছে। ভাইয়ার ব্যাপারে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আব্বাকে দাফন করে আসার পর বাসায় ঢোকার আগে ভাইয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ভাইয়া মোটেও কাঁদেনি। আমি বুঝতে না পারলেও মা বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলো। ভাইয়া অজ্ঞান হওয়ার পর মা আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলো। আমরা তখন দুটো শোক পালন করছি। একে তো আব্বা মারা গেছেন, আরেক দিকে ভাইয়া অজ্ঞান। মা যখন অজ্ঞান হয়ে পড়লো, তাকে নিয়ে ভাইয়া হাসপাতালে গেলো। কিন্তু ভাইয়াকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার কথা

কেউ মনে করলো না। অবশ্য তখন আমাদের বাসায় শুধু দুই খালা ছিলো। খালুরা জানাজা শেষ করেই চলে গেছেন। ভাইয়ার বন্ধুরা বলে গিয়েছিলো যদি জ্ঞান ফিরতে বেশি সময় লাগে তাহলে অথবা যে কোনো দরকারে তাদেরকে ফোন দিয়ে জানাতে। তারা সারা রাত জেগে ছিলো। সে জন্য আর তাদেরকে জানাইনি। ভাইয়ার জ্ঞান ফিরতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগলো। জ্ঞান ফেরার পর ভাইয়া ঝরঝর করে কেঁদে দিলো।’

নাবিলা হাত দুটো কোলের উপর রেখে দিয়েছিলো। কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর চোখ দিয়েও পানি বেরিয়ে গেলো। পানি গিয়ে পড়লো হাতের উপর।

‘এখন কী অবস্থা তোমার ভাইয়ার?’

‘ভাইয়া পর দিন থেকেই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। খালারা মা’র হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছে সংসার চালানোর জন্য। তাতে মনে হয় আমাদের দু মাস চলে যাবে। কিন্তু ভাইয়া তা জানে না। অবশ্য জানানোর সুযোগও হয়নি। আজকে বুধবার না? গত শনিবারই তো মাস শেষ হলো। ভাইয়া মা’র হাতে বাসা ভাড়ার টাকা তুলে দিলো। পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দিলেই চলে। কিন্তু ভাইয়া মা’র হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে বললো, বাড়িওয়ালার অন্য ভাড়াটিয়া খুঁজতেও পারে। ভাববে বাপ মারা গেছে—এরা ঠিকমতো ভাড়া দিতে পারে কি না। সে জন্য তুমি আজই ভাড়া দিয়ে দাও। ভাইয়ার ব্যাপারে মা কিছু জানতে চাইলে ভাইয়া বলে : মা, তুমি শুধু দোয়া করো। মা তখন চুপ করে যায়। ভাইয়াকেই এখন সংসার চালাতে হবে। নিষেধ করেও বা কী লাভ? আমার মনে হয় কী, জানো?’

‘কী?’

‘ভাইয়া যে আগেভাগেই চাকরি করা শুরু করা দিয়েছিলো, সেটা ছিলো সংসারের হাল ধরার প্রস্তুতি। বিশ্ব ব্যবস্থাপক আগে থেকেই তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তুলছিলেন।’

‘তোমার ভাইয়ার কথা আকস্মিক বলেছি। আকস্মিক বলেছে, এই ছেলে এক সময় অনেক উন্নতি করতে পারবে। আকস্মিকও এক সময় প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে ছিলো। আকস্মিক দুই ভাই। বোন তিনটা। এক ফুপু তো আমাদের এখানেই। উনি সবার ছোট। আর দুই ফুপু সবার বড়। আকস্মিক তিন নম্বরে, তারপরে চাচা। ওনারা দুই ভাই মিলে অন্যের ক্ষেতে ধানের চারা বুনতেন। চারা বুনে যে কয় টাকা পেতেন, তা দিয়ে তেল-লবণ-মরিচ কেনা হতো। দাদাভাইয়ার

জমি ছিলো, তবে তা সামান্য। তাতে যে ধান হতো, সে ধান দুই মাসেই শেষ হয়ে যেতো। খালে ভেসাল জাল পাতা ছিলো। সেই জালে যে মাছ ধরা পড়তো, তা দিয়েই ওনারা খেতেন। রাস্তার পাশে না কি দাদাভাইয়া কিছু শাক-সবজি চাষ করতেন। বর্ষাকালে সেটা পারা যেতো না। এখন যেমন পানির উপরে কচুরিপানার ভেলা বানিয়ে শাক-সবজি চাষ হয়, ওনাদের সময় এটা কারো মাথায় আসেনি। দুই মাসের ধান ওনারা চার মাস খেতেন। ভাত খেতেন দু বেলা। এখান থেকে এক বেলায়টা বেঁচে যেতো। তাতেও তো তিন মাস হওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু দাদুমণি বাকি দুই বেলায় চাল থেকেও এমনভাবে মুষ্টি রাখতেন, যাতে আরেক বেলা টেনেটুনে চলা যায়। বর্ষাকালে মাছ বেশি ধরা পড়তো। সেগুলো বেচে চাল কিনতেন। ছাগল আর হাঁস-মুরগী বিক্রি করেও কিছু আয় হতো। এভাবে বাকি আট মাসের ব্যবস্থা করতেন। মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আব্বু ঢাকা চলে আসেন। এসে ম্যাচের কারখানায় কাজ করেন। তারপর গেলেন ওষুধ কোম্পানিতে। কিন্তু আব্বু লেখাপড়া বাদ দেননি। মেসে পড়ালেখা হতো না বলে মসজিদে গিয়ে পড়তেন।’

নাবিলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, ‘দোয়া কোরো, ভাইয়াও যাতে সফল হতে পারে।’

‘তা তো অবশ্যই।’ মনে মনে বললো, ‘তোমার চেয়ে আমি বেশি দোয়া করি।’

ড্রইং রুমে বসে এতক্ষণ কথা চলছিলো দুজনের। সিহিয়া বললো, ‘চলো, আমার ছাদ বাগানে বসে কথা বলি। তার আগে এক মিনিট দাঁড়াও।’

সিহিয়া দৌড়ে গিয়ে দুটো হাফ প্লেটে নুডলস নিয়ে এলো। একটা নাবিলার হাতে তুলে দিয়ে বললো, ‘এসো আমার সাথে।’

‘তুমি পাগল না কি? দুপুরে ভাত খেয়েছি না? এতগুলো এখন কীভাবে খাবো?’

‘কথা বলতে বলতে খেলে টের পাওয়া যাবে না।’

সবাই ফুল গাছ লাগায় ছাদের চার দিকে। সিহিয়ার ফুল গাছগুলো একেবারে ছাদের মাঝখানে। সবার মাঝখানে বড় একটা ড্রাম। কিন্তু সেটায় কোনো বড় গাছ নেই। ড্রামে লতানো ফুলের গাছ লাগানো। ড্রামের চতুর্দিকে বাঁশের চেরা পুঁতে সেগুলোর মাথা একসাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। বন্ধ করা ছাতার

মতো আকৃতি। সেই ছাতা আঁকড়ে ধরে আছে লতাগুলো। ড্রামকে কেন্দ্র করে পাঁচটা বৃত্তে অনেক প্রজাতির ফুল গাছ।

সিঁড়ি ঘরের দেয়ালে গুটানো ত্রিপলের দুটো ছক টেনে নিয়ে ছাদের দুই কোনায় পিলারের সাথে লাগানোর পর ছায়ার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। ছায়ার নিচে চেয়ার টেনে নিয়ে এলো সিঁহিয়া।

নাবিলা বললো, ‘এখন তো রোদের তেজ নেই। খোলা ছাদে বসলেই ভালো হতো। বাইরের সব কিছু দেখতে দেখতে কথা বলা যেতো।’

সিঁহিয়া জানালো, ‘সমস্যা তো এখনি বেশি। ঐ যে বাঁশগুলো দেখতে পাচ্ছে, ওর ফাঁকে অনেক পাখি থাকে। ওদের বাসায় ফেরার সময় হয়েছে। ঘরে ঢোকার আগে ছাদের এখানে-ওখানে গিয়ে বসবে। আমরা যেমন রাতে খাওয়ার পর হালকা ব্যায়াম করি, ওরাও মনে হয় তেমনি ব্যায়াম করে নেয়। এই ব্যায়াম করতে গিয়ে ওরা পেট খালি করে ফেলে। পেট খালি করার কাজটা তোমার মাথার উপরেও করতে পারে। নাবিলা, আমার মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স কত ছিলো, জানো?’

‘কত?’

‘নয় বছর। খ্রিতে পড়ি। স্কুল ছুটি হলে মেয়েরা খেলাধুলা করতো। আমি চলে যেতাম আম্মুর কবরের কাছে। আমাদের স্কুলের পিছনে ছিলো গোরস্তান। সেখানেই আম্মুর কবর। আমি একা গিয়ে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাইয়ের আসন্ন জন্মের কারণে এমনিতেই মায়ের কাছে কম যেতে পারতাম। মা অসুস্থ ছিলেন; আমাকে ততটা আদর করতে পারতেন না। সুতরাং মায়ের অভাবটা দিন দিন তীব্র হচ্ছিলো। এর মধ্যে যখন মা মারা গেলেন, আমার কষ্ট যে কী পরিমাণ তৈরি হলো বুকের ভিতরে, তা শুধু আমি জানি। ভাঁপা পিঠা কীভাবে বানায়? ভাঁপ বের হওয়ার জন্য যে পাতিলে পানি চড়ানো হয়, সেই পাতিলের মুখে ঢাকনা দেয়ার পর পাতিল আর ঢাকনার জোড়াটা খামির দিয়ে আটকে দেয়া হয়, যাতে কোনোমতেই গরম ভাঁপ বাইরে যেতে না পারে; শুধু একটা ছিদ্রে এসে সব ভাঁপ জড়ো হয়। আমার কষ্টগুলো তেমনি জমা হতো; বের হতে পারতো না। স্কুল ছুটির পর মায়ের কবরের কাছে এসে সেগুলো ছেড়ে দিতাম। সেটাই ছিলো আমার কষ্ট বের করার একমাত্র উপায়। আমি মায়ের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদতাম; জালাল কাকু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বিশ-তেরিশ মিনিট পর আমার নাম

ধরে ডাক দিতেন। তার সাথে আমি বাড়ি ফিরতাম। আমাদের কারো মধ্যে কোনো কথা হতো না। আমি আমার কষ্ট কারো সাথে ভাগ করতাম না। জালাল কাকু হয়তো বিষয়টা আব্বুকে বলতেন। কিন্তু আব্বু কখনোই আমার কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি। হয়তো ফুপুকে বলতেন। আমাদের কথা আবার ফুপু বুঝতে পারেন। ফুপু আমাকে যত বেশি সম্ভব আদর করার চেষ্টা করতেন। কথা বলতে পারলে হয়তো তিনি বলতেন, তোর মা তোর ভাইয়াকে নিয়ে বিশাল এক বাগান বাড়িতে আছে। তোর জন্য, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের দিনগুলো তার কাছে সেকেন্ডের মতো। সে ভাবছে, এই তো ওরা কালই চলে আসবে। অনেক কথা বললাম। স্যরি। তোমার মনটাও খারাপ করে দিলাম।’

নাবিলা আকাশের দিকে তাকালো। অনেক কাককে দেখা যাচ্ছে বাড়ি ফিরতে। কিছু কাক এ দিক সে দিক ঘোরাফেরাও করছে। এদের বাড়ি হয়তো আশেপাশেই। মাঝেমধ্যে দু-একটা বকও দেখা যাচ্ছে। বকেরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ফিরছে। মাটির মানুষ যখন মাটিতে ফিরে যায় তখন তাদের মাথাও উত্তর দিকে রাখা হয়। দূরে চিলের জটলা দেখা যাচ্ছে— সম্ভবত এয়ারপোর্টের পরে যে ময়লার ভাগাড় আছে, সেখানে।

চিলগুলোর দিকে বেশি সময় ধরে তাকিয়ে থাকলে মাথাও মনে হয় চক্কর দিয়ে ওঠে। চোখ নামিয়ে নিয়ে সিঁহিয়ার কথার জবাবে নাবিলা বললো, ‘মন যে খুব ভালো আছে, তা তো না। তুমি আর কী মন খারাপ করবা? তুমি তো কেবল তোমার নিজের কথাগুলো বলেছো। অন্যের দুঃখ কখনো দুঃখ বাড়িয়ে তোলে, কখনো সান্ত্বনা হিশাবেও কাজ করে—তাই না? নিজের দুঃখের চেয়ে অন্যের দুঃখ বেশি হলে মানুষ তখন মনকে বুঝানোর চেষ্টা করে, সে এত দুঃখ বইতে পারলে তুমি কেন পারবা না?’

‘তুমি কিন্তু নুডুলস খাচ্ছে না। মনে হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দাও, আবার গরম করে আনি। টমেটু দিয়েছি বলে আর টমেটু সস মিশাইনি। দুটোই তো টমেটু। অবশ্য কেনা সস হলে দুটো একই জিনিশ হতো না। আমার নিজের বানানো বলে বললাম। তুমি খেতে চাইলে অবশ্যই নিয়ে আসবো। তেঁতুলের সসও আছে।’

‘দুটোই নিয়ে আসো।’

‘না, আজকে তেঁতুলেরটা খাও। টমেটু আগামীকাল খেও। আরেক দিন

খাওয়ানো মরিচেরটা।’

১১

দিনে চাকরি খোঁজা আর রাতে ডিম বেচার জীবন শুরু করেছে শিহাব। টেক্সটাইলের চাকরি যতটা সহজ মনে করেছিলো, মোটেও সে রকম না। এই কদিন আগেও কত ব্যানার দেখতো জরুরী নিয়োগ নামে! কিন্তু এখন কোনো ব্যানার নেই। আচ্ছা, এ সব চাকরিরও কি কোনো ঋতু আছে? ধান কাটার বা মাটি কাটার জন্য বছরের একটা সময় যে রকম নির্দিষ্ট থাকে, সে রকম কোনো সময় এখানেও আছে হয়তো।

দিনে চাকরি খোঁজা বলতে সারা দিন সম্ভব হয় না। ঘণ্টা দু-একের মতো সময় দেয়া যায়। দু ঘণ্টায় চার-পাঁচ জায়গায় যাওয়া যায়। সবখানেই গার্ডের সাথে কথা বলতে হয়। ভিতরে ঢোকানো কোনো সুযোগ নেই। গার্ড আবার এইচআরের সাথেও কথা বলতে দেয় না। কেউ কেউ বলে, ‘আমার কাছে বায়োডাটা রাইখা যান, আমি পৌঁছানো দিচ্ছি নে।’

তিন দিন এভাবে চলার পর অন্য কৌশলে চেষ্টা শুরু হলো। এতে যদিও এক দিনে এক জায়গাতেই কথা বলা সম্ভব, কিন্তু তারপরও ওর কাছে মনে হলো বেশ কাজে দেবে। সাড়ে আটটার দিকে একটা টেক্সটাইলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতো। চোখ রাখতো রাস্তায়—কখন ওফিসারদের বাস আসে। ওফিসাররা বাস থেকে নামলে কোনো একজনকে টার্গেট করে কথা বলার চেষ্টা।

‘আসসালামু আলাইকুম। আমি কি আধা মিনিট কথা বলতে পারি আপনার সাথে?’

‘জি, কী বিষয় বলে ফেলুন।’

‘আমি আসলে জবের জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন তো আপনাদের কোনো বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাচ্ছি না। এইচআরের সাথে যোগাযোগেরও না কি কোনো সুযোগ নেই। সিভিটা যদি...।’

কেউ কেউ বলতো, ‘গার্ড রুমে রেখে যান, ওরাই পৌঁছে দেবে।’

দুজন লোক নিজের হাতে ওর সিঁড়ি নিয়ে বলেছে, ‘আচ্ছা, আমার কাছে দেন, পৌঁছে দেবো।’

একজন প্রায় তিন মিনিট সময় দিয়েছিলো। সে বলেছে, ‘বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে তো সব টেকনিক্যাল কাজ। আপনি লেখাপড়া যাই করেন না কেন, টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে একটা সময় গিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা কাজে দেবে। কিন্তু শুরুতে এ রকম ছয়-সাত-আট হাজার টাকা বেতনেই ঢুকতে হবে।’

এক ভদ্রলোক ওর মোবাইল নম্বরও রেখে দিয়েছিলো। বলেছিলো, ‘আমিই আপনাকে জানানো কোনো সুযোগ থাকলে। আর আপনিও মাঝে-মধ্যে খোঁজ নিয়ন—যদি আমি ভুলে যাই।’

তিন দিন পুরোপুরি ব্যর্থ হতে হয়েছে। যাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলো তারা কথাই বলেনি। একজন বলেছে, ‘ওফিশের বাইরে কী? ওফিশে এসে কথা বলুন।’ ওকে হয়তো কোনো শ্রমিক মনে করেছে।

তবে এভাবে আর চাকরি খোঁজার পিছনে সময় দেয়া ঠিক হবে না। পনেরো দিন পর্যন্ত এভাবে চাকরি খুঁজবে—এ চিন্তা করে রেখেছিলো। এরপর সময়টা দিলো ড্রাইভিং শেখায়। ড্রাইভিংয়ের আগে একবার সব কিছু বাদ দিয়ে রিকশা চালানোর কথা মাথায় এসেছিলো। কিন্তু রিকশা চালানোর মতো শক্তি ওর শরীরে নেই। তেইশ বছরের এক যুবকের গায়ে তিন তেইশে উনসত্তর কেজি ওজন থাকা দরকার। কিন্তু ওর ওজন পঞ্চাশের ঘরে। যদি মটর রিকশা থাকতো, তাহলে চালানো যেতো। ঢাকায় এখন মটর রিকশা বন্ধ। দুনিয়ার সব দেশ আগায় আর আমাদের দেশ পিছায়। পুলিশগুলোকে রিকশা টানতে দেয়া উচিত। তখন বুঝবে রিকশা টানার কষ্ট কেমন।

যার কাছে ড্রাইভিং শিখছে, তার নাম শাহাদাত। শাহাদাত ভাই বলেছে, ‘ড্রাইভিং শিখবেন, ভালো। অনেক শিক্ষিত লোকই ড্রাইভিং পেশায় আসার জন্য ড্রাইভিং শিখছে। কিন্তু ড্রাইভিং শেখার চেয়ে বড় কথা হলো ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করা। অবশ্য টাকা দিলে এই দেশে সবই হয়। আমার সাথেও বিআরটিএর লাইন-ঘাট আছে। যাই হোক, পরের কথা পরে। আগে শিখতে থাকেন।’

শেখার আগেই সে বলে নিয়েছে, ‘আমি কিন্তু কখনো বলবো না ভালো

পারছেন। সব সময় ঝাড়ির উপরে রাখবো। যে দেশের যে নিয়ম। জাপানে গাড়ির হর্ন শোনা যায় না। আর আমাদের দেশে হর্ন না বাজালে কাজ হয় না। আমাদের দেশের নিয়ম হলো ওস্তাদ সব সময় সাগরেদকে ঝাড়ির উপরে রাখবে। ওস্তাদ-সাগরেদের লাইনে গালিও শুনতে হয়। আপনি যেহেতু শিক্ষিত মানুষ, সেই সাথে টাকার বিনিময়ে শিখছেন, সে কারণে গালি শুনতে হবে না; আমার চা-সিগারেটও কিনে আনতে হবে না। তবে ঝাড়ির কারণে মন খারাপ করবেন না। ঝাড়ি দিলে ভাববেন আপনি ঠিক লাইনে আগাচ্ছেন। আর যদি কিছু না বলি তাহলে ধরে নেবেন আপনি কিছু শিখতে পারছেন না।’

লোকটা অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো ঝাড়ি দেয়নি। চুপ করেও থাকেনি কোনো দিন। প্রথম দিন জানতে চেয়েছিলো, ‘আপনি কি মটর সাইকেল চালাতে পারেন?’

‘না। বাইসাইকেল চালাতে পারে।’

‘আপনার রাস্তার জ্ঞান ভালো। ভালোভাবেই শিখতে পারবেন।’

মেসের বন্ধুরা ড্রাইভিংয়ের কথা জানে না। ওরা শুধু ডিম বিক্রির কথা জানে। বাসায় জানে না কোনোটা। প্রথম যে দিন স্টোভ, পাতিল, চাকু আর চামচ কিনে এনে মেসে রাখলো, একেকজন একেক মন্তব্য শুরু করলো। মন্তব্যগুলো ছিলো এ রকম—

‘গ্যাস কি ফুরিয়ে গেলো?’

‘তাবলিগ জামাতে শামিল হচ্ছে না কি কেউ?’

‘পিকনিক হবে না কি ছাদে? তাহলে তো লিমন খেতে পারবে না।’

শিহাব যখন যন্ত্রপাতিগুলোর উদ্দেশ্যের কথা জানালো, কেউ আর কিছু বললো না। যদিও আগে থেকেই ওকে সবাই মোটামুটি মান্য করে, কিন্তু সেটা কেবল কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায়। বন্ধুত্ব ফলানোর বেলায় কোনো কমতি নেই। ওর আক্বা মারা যাওয়ার পর এখন আবার মনে হচ্ছে যেন সবাই ওকে সমীহ করে চলে। সবার চেয়ে ওর বয়স বুঝি দশ বছর বেড়ে গেছে।

সবাই দোকান দেখতে আসার পরিকল্পনা করলেও এখন পর্যন্ত সবাই মিলে সময় বের করতে পারেনি। সবার সমস্যা টিউশনি নিয়ে। প্রত্যেকেরই ছাত্রের পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কোনো এক বন্ধুর দিন সবাই মিলে

আসবে। তার আগেই শাকিল একা চলে এসেছে আজ।

একটাই যেহেতু টুল, শাকিলের বসার কোনো সুযোগ নেই। শিহাব যখন বসে, শাকিল দাঁড়িয়ে থাকে; আবার শাকিলকে বসিয়ে শিহাব দাঁড়ায়।

শাকিল এখন শিহাবের পিছনে দাঁড়ানো। দুজনের ওঠা-বসার সাথে কথাও চলছে। শাকিল প্রশ্ন করলো, ‘আজীবন কি ডিম বিক্রি করবি?’

‘করলাম। তোর কোনো সমস্যা আছে?’

‘না দোস্ত, স্থায়ী পেশা হিশাবে ডিম বিক্রিকে বেছে নিতে পারবি না। কোনো দিন বৃষ্টি হবে। তোর কিন্তু সে দিন বিক্রি বন্ধ। তা ছাড়াও...।’

‘তা ছাড়া কী?’

‘তোর পাশে আরেকজন এসে বসলে তোর বিক্রি অর্ধেকে নেমে আসবে। তরকারিওয়ালারা এক কেজি টমেটুর জায়গায় দুই কেজি টমেটু গছাতে পারে এই বলে, দাম তো কম। নিয়ে যান। এমন সরস টমেটু আর পান কি না, সন্দেহ। কিন্তু ডিমের দোকানদাররা কাস্টমারকে একটার জায়গায় দুইটা ডিম গছিয়ে দিতে পারে না।’

‘চুপ কর, কাস্টমার আসছে মনে হয়।’

হ্যাঁ, লোকটা ডিম খেতেই এসেছে। শিহাবের সামনে এসে কোনো বিরতি না দিয়ে বা জবাবের অপেক্ষা না করে বললো লোকটা, ‘ডিম কত কইরা রে? দেশী তো? দুইটা হাফ বয়েল দে তো। লবণ বেশি কইরা দিস।’

শিহাব চোখ তুলে এক ঝলক তাকে দেখে নিয়ে ডিম ছুলতে শুরু করলো। মনে হচ্ছে ঢাকা গেটের একটা পিলার কেউ তুলে এনে ওর সামনে দাঁড় করিয়েছে। এই শীতের মধ্যেও লোকটার গায়ে শুধু একটা পাতলা হুডি। শিহাব ডিম ছুলছে হাত দিয়ে; কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে কান। জীবনে ও এই প্রথম অপরিচিত কোনো লোকের মুখ থেকে তুই সম্বোধন শুনলো। ভবিষ্যতে আরো শুনতে হবে। প্রত্যেক দিনই শুনতে হবে। শুনতে শুনতে এক সময় আর কান গরম হবে না।

লোকটা অনেক আয়েশ করে ডিম খেতে থাকলো। এমনিতে ডিমের মাঝখান দিয়ে একটা ফাড়া দিলেই হয়। কিন্তু তাকে দুই ফাড়া দিয়ে চার টুকরা করে দিতে হলো। ডিম তো খুব একটা শক্ত জিনিশ না। তারপরও লোকটা আওয়াজ করে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে ডিম না, হাইব্রিড শসা খাচ্ছে। শিহাব ভেবেছিলো লোকটাকে বিদায় করে কানে একটু ঠাণ্ডা পানি লাগাবে। কিন্তু

তার খাওয়ার স্টাইলে মনে হচ্ছে দুটো ডিম খেতে দশ মিনিট লাগবে। মাঝখানে তিনবার লবণ মেশালো। লোকটা মনে হয় সব খাবারে দারুণ মজা পায়। চিরতার রসও হয়তো আয়েশ করে খায়।

লোকটা বিদায় হওয়ার পর শিহাব বললো, ‘বল তো, ঢাকা শহরে মোটা লোকের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে।’

‘বাড়ছে।’

‘তাহলে ডিম বিক্রিও বাড়বে। চিন্তা করিস না। দেখলি না লোকটা এসেই দুইটা চাইলো।’

‘আচ্ছা, ভালো হলে ভালো। চাকরি খোঁজার পিছনে সময় নষ্ট না করে আমরা সবাই তাহলে তোর সাথে এসে যোগ দেবো। শুধু ডিমের বিভিন্ন আইটেম দিয়ে একটা দোকান দেবো বড় করে। ডিম পোচেরই পাঁচটা আইটেম থাকবে। সয়াবিন তেলে ডিম পোচ, খাঁটি ঘি দিয়ে ডিম পোচ, তেল ছাড়া শুধু পানিতে ডিম পোচ, সরিষা তেলে ডিম পোচ, পানির ভাঁপে ডিম পোচ। কিন্তু কথা হলো দোস্ত, ডিম আর কতগুলো আছে বিক্রি শেষ হতে? আজকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে—মনে আছে তো?’

আজকে মেসের ম্যানেজার নির্বাচন। সেখানে থাকতে হবে। তবে শিহাব বলে দিয়েছে, ওকে যাতে ম্যানেজার নির্বাচিত করা না হয়। ওর আব্বা মারা যাওয়ার পর থেকে বাসায় ঘুমানো শুরু করলেও মেস থেকে ওর নাম কাটা যায়নি এখনো। নতুন কোনো সদস্য পাওয়া গেলে উঠানো হবে; কিন্তু ওর নাম কাটা যাবে না। ওকে রাখার অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে বড় কারণ সম্ভবত ও এই এলাকারই ছেলে। যদিও ওদের বাড়ি নেই এখানে, কিন্তু ওদেরকে সবাই চেনে। মাস ছয়েক আগে একটা ঝামেলা থেকে শিহাবই সবাইকে উদ্ধার করেছিলো। লিমন না কি ছাদে উঠে আরেক বাড়ির কোন মেয়ের সাথে ইশারায় প্রেম করা শুরু করে দিয়েছিলো। সেই মেয়ের বাপ এসে বাড়ির মালিক তাহের সাহেবকে বললেন মেস বন্ধ করে কোনো পরিবার উঠাতে। তাহের সাহেব শুক্রবার মেসের সবাইকে নিয়ে মিটিং ডাকলেন। তিনি জানালেন, যদিও মনির সাহেব বলেছেন মেস বন্ধ করে দিতে, কিন্তু তিনি মেস বন্ধ করতে রাজী না। ফেমিলি ভাড়া দিলে অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া ফেমিলি বাসা খালি থাকে বেশি। মেস কখনো খালি থাকে না। মেসের একজন চলে গেলে বাকিরাই আরেকজন সদস্য জোগাড় করে। একটা

পরিবারের কারো সমস্যা হলে পুরো পরিবারটা চলে যায়। তিনি মেস বন্ধ করতে চান না ঠিকই; ওদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে উঠাতে চান।

শিহাব পরের দিন তাহের সাহেবের স্ত্রীর কাছে গেলো। বললো, ‘খালাম্মা, অন্যরা যে ভালো হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে? মনির কাকা বলেছেন মেসের কে না কি ছাদে উঠে তার মেয়েকে আজেবাজে কথা বলে। আপনিই বলুন—আপনার বাড়ি তিন তলা আর লিজাদের বাড়ি পাঁচ তলা। তিন তলার ছাদ থেকে পাঁচ তলার ছাদে কথা বলা যায়? খালাম্মা, এই যে তিন বছর ধরে ওরা আছে, ওদের মধ্যে আপনি খারাপ কিছু দেখেছেন? ওদের মধ্যে কেউ সিগারেট খায়? মেসের মধ্যে কোনো দিন চিল্পাপাল্লা শুনেছেন? মনির কাকার যেমন এ মহল্লায় বাড়ি আছে, আপনাদেরও তো বাড়ি আছে। আমরা সবাই আপনার ছেলের মতো। আপনার ছেলের নামে যদি কেউ এ রকম অভিযোগ করতো তখন কি আপনি তাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতেন? আপনারাও তো মনির কাকাকে বলতে পারেন, তার মেয়েকে যেন তিনি দেখে রাখেন।’

তাহের সাহেবের স্ত্রী বুঝলেন এবং জানালেন তিনি বিষয়টার দায়িত্ব নিচ্ছেন। ওদেরকে কিছু ভাবতে হবে না। তবে যার কারণে সমস্যা সে আর কখনো ছাদে উঠবে না—এই নিশ্চয়তা তাকে দিয়ে আসতে হলো। তার যদি জামা-কাপড় শুকাতে দেয়ার দরকার হয়, তাহলে অন্য কেউ দিয়ে দেবে।

তাহের সাহেবদের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে শিহাব শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো, ‘কাজটা যেই করিস, মোটেও ঠিক করিসনি। তোদের কারণে খালাম্মাদেরকে কেন কথা শুনতে হবে? তোরা জানিস, আমি খালাম্মাকে কত শ্রদ্ধা করি?’

বাড়িওয়ালীর সাথে বৈঠক শেষ হওয়ার পর আবার মেসেও বৈঠক বসেছিলো। সেখানে লিমনকে সবাই চেপে ধরলো।

‘মাত্রা কত চলছে রে?’

‘এ জন্যই তুমি ইদানীং অতি মাত্রায় ভদ্র হয়ে গেছো চান্দু?’

‘কাউকে না জানিয়ে ও এ কাজ কোন দুঃসাহসে করলো? কাফফারা আদায় ছাড়া তো এ থেকে রেহাই পাওয়ার দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই।’

‘শান্তিটা একটু হালকা করে দিস রে।’

‘আরে রাখ, তোরা আগেই শান্তির দিকে যাচ্ছিস। অপরাধটা একটু অপরাধীর নিজের মুখ থেকে শোনা যাক না। ও তো চুপ মেরেই বসে আছে। এই

লিমন, বল দেখি কী করে কী হলো?’

‘ও আচ্ছা, এখনো চোখ টিপের পর্যায়ে আছে? যাক, সহজেই পার পেয়ে গেলি। এখন তোর জন্য কাফফারা হলো সালামের রেস্টুরেন্টে প্রত্যেককে ডাবল মোগলাই খাওয়ানো। তবে তুই না খেয়ে থাকবি। সবাই খাবে, তুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি। তুই শুধু পানি খাবি। শেষে বিলটা দিয়ে দিবি।’
লিমনের ছাদে না উঠতে পারার কাহিনী এই।

শাকিলের কথার জবাবে শিহাব বললো, ‘আচ্ছা, তুই যখন বলছিস, একটু তাড়াতাড়ি যাই। তুই কি বসবি না আমার সাথে যাবি? এগুলো রেখে আসতে বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।’

‘এখানে বসে থেকে কী করবো? তার চেয়ে তোর সাথেই যাই।’

হাতিরঝিলের দক্ষিণে একটা রিকশার গ্যারেজ। সেখানে শিহাব ওর যন্ত্রপাতি এনে রাখলো।

গ্যারেজের ম্যানেজার বসে আছে। শিহাব প্রশ্ন করলো, ‘কেমন আছেন মালেক ভাই?’

মালেক নামের লোকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, ‘আছি আল্লাহর রহমতে ভালাই। আমার তো সারা বছর সিজন ভাল। ঝড়-বাদলা শীত-গরম, হরতাল-কার্যু কোনো কিছুতে কিছু যায়-আহে না। ইনকাম খাড়া।’

‘ভাবী আছে কেমন?’

‘আছে ভালাই। বহো।’

‘না। আজকে আমার একটু তাড়া আছে। আপনার ছেলে-মেয়ের কী অবস্থা?’

‘আছে সবাই ভালাই আছে।’

শিহাব আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলো। শাকিল জানতে চাইলো, ‘তাড়া কত?’

‘ভাড়া সামান্যই। মাসে পাঁচশো। দিন হিসাব করলে সতেরো টাকার মতো। রিকশা রাখতে অনেক জায়গা লাগে। আমার এগুলোতে তো সে রকম কোনো জায়গা লাগে না। দেখলি না ম্যানেজারের চকির নিচে রেখে দিলাম?’

‘তোর ডিম-টিম খেয়ে ফেললে?’

‘ধুর ব্যাটা। তুই তো পোলাপানের মতো কথা বললি। ডিম খেলে কি এই

লোক ব্যবসা করতে পারবে? আমি কি আর ওনার এখানে জিনিশপত্র রাখবো? আর আমার জিনিশের দাম কত? তার চেয়ে ওনার এখানে তো কয়েক লাখ টাকার রিকশা আছে।’

বাসে ওঠার জন্য রামপুরা ব্রিজের দিকে আসতে আসতে শিহাব প্রশ্ন করলো শাকিলের দিকে ফিরে, ‘কিছু খাবি?’

‘না। এখন আবার কী খাবো? মেসে তো খানাদানা রেডি আছেই।’

মেসের ম্যানেজার নির্বাচনের দিন খাওয়াদাওয়া ভালো হয়। খাওয়াদাওয়া ভালো হলে বিদায়ী ম্যানেজার বাহবা পায়।

‘আরে, সেই খানা না। তুই আজকে আমার দোকানে এসেছিস, তোকে তো খাওয়ানো উচিত, তাই না? চল, শীতকালে আইসক্রিমই খাই। গ্রীষ্মের দুপুরে চা আর শীতের রাতে আইসক্রিম খাওয়ার মজা অন্য রকম।’

মেসের মিটিং শেষ করার পর শিহাবকে আরেকটা মিটিংয়ে হাজির হতে হলো। এটা আজ রাতে না হয়ে আগামীকাল হলেও কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু মিটিং না হওয়া পর্যন্ত ওর মুক্তি নেই। মিটিংটা ওকে নিয়েই। খালারা আবার সবাই হাজির হয়েছেন। তাদের মিটিংয়ে অনেক বিষয় থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত ঘুরে-ফিরে এক জায়গায় এসে আলোচনা ঘুরপাক খায়। সেটা হলো ওর বিয়ে।

শিহাব ঘরে ঢোকার সাথে সাথে মা-খালারা হৈ হৈ করে উঠলেন। শিহাব বললো, ‘আমি মেস থেকে খেয়ে এসেছি। তোমাদের যা বলার পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। গোসল করেই ঘুম দেবো।’

খালারা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ছোট খালা বললেন, ‘আগে তুই এসে আমাদের সামনে একটু বস।’

শিহাব চেয়ার টেনে বসে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘বসলাম।’

‘চেহারার কী দশা বানিয়েছিস?’

‘আমার চেহারা নিয়ে ভাবতে হবে না খালা। টাকের জন্য আটকালেও ছেলেদের চেহারার কারণে কখনো বিয়ে আটকায় না। আমার মাথায় যথেষ্ট পরিমাণ চুল আছে। ঘুম খুব ভালো হয়। মাথায় ভবিষ্যতের চিন্তা আছে; কিন্তু কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই।’

‘তুই সারা দিন কী করিস, বল তো। কম্পিউটারের যে দোকানে ছিলি,

সেখানে না কি যাস না?’

‘যাই না। ওরা বেতন বাড়িয়ে দেবে বলেছিলো। কিন্তু আমার যা দরকার তা বর্তমানের চার গুণ। ওরা সর্বোচ্চ দ্বিগুণ দিতো।’

‘তাহলে করছিসটা কী?’

‘ড্রাইভিং শিখছি।’

চার মা-খালা চোখ বড় করে একসাথে বলে উঠলেন, ‘কী?’

ছোট খালা বললেন, ‘ড্রাইভারি করবি? ড্রাইভারদেরকে সবচেয়ে খারাপ মানুষ হিসাবে দেখা হয়, জানিস না?’

‘তাহলে কী শেখা যায়, তোমরা একটা বুদ্ধি দাও।’

‘এত শেখার কী আছে? চাকরি করবি।’

‘চাকরি খোঁজাও চলছে খালা। চিন্তা করো না।’

‘তাহলে আবার ড্রাইভিং শেখা লাগবে কেন? বাসায় বসে থাকবি। যেখান থেকে ডাকবে, সেখানে যাবি।’

‘আর যদি চাকরি না হয়?’

‘হবে না কেন? প্রত্যেক দিন কি ছেলেপেলে চাকরিতে ঢুকছে না?’

‘প্রত্যেক দিন ছেলেপেলে যেমন চাকুরের দলে ঢুকছে, তেমনি প্রত্যেক দিন ছেলেপেলে বেকারদের দলেও যোগ দিচ্ছে। সে জন্য অন্য রাস্তাও খোলা রাখার ব্যবস্থা করছি।’

‘অন্য রাস্তাটা কী?’

‘খালা, তোমাদেরকে যদি বলি দশ লাখ টাকা দিলে পনেরো হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি পাওয়ার সুযোগ আছে, তোমরা সেটাও হয়তো যোগাড় করে দেবা। কিন্তু যদি বলি এক লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলে মাসে বিশ হাজার টাকা আয় করার সুযোগ আছে, তোমরা এক টাকাও দেবা না।’

‘চাকরির তো নিশ্চয়তা আছে। তোর ব্যবসার কী নিশ্চয়তা আছে? তা ছাড়া তুই ব্যবসার কী বুঝিস? তোর বাপ-দাদা কোনো দিন করেছে ব্যবসা?’

‘আমাকে বলতেও দাও খালা। চাকরির খোঁজ নিয়েছি। যে পরিমাণ বেতনের চাকরি দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার পোষাবে না। সে জন্য ভাবছি ব্যবসার রাস্তা খোলা রাখতে। কিন্তু ব্যবসা করতে যেহেতু টাকা লাগবে, তাই কিছু টেকনিক্যাল কাজ শিখে রাখা উচিত। টেকনিক্যাল কাজ জানা থাকলে কিছু

না কিছু করা যায়ই।’

‘তুই তো কম্পিউটারের কাজও জানিস। সেটা কি টেকনিক্যাল কাজ না?’

‘কম্পিউটারের কাজ যা জানি, তা আজকাল ওয়ান-টুর ছেলে-মেয়েরাও জানে।’

‘তাহলে তুই ড্রাইভারগিরি করে টাকা জমাবি; সেই টাকা দিয়ে ব্যবসায় নামবি?’

‘নামবো কি না তা বলতে পারি না। প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম।’

‘কী ব্যবসা করবি?’

‘এখনো বলতে পারছি না। চাকরির মতো ব্যবসার বেলায়ও যেটাতে লাভ ভালো দেখবো সেটা করবো। যদি দেখি ভেড়ার ব্যবসায় লাভ বেশি তাহলে ভেড়ার ব্যবসা করবো।’

‘তুই এ রকম উল্টাপাল্টা কথা বলছিস কেন আমাদের সাথে?’ এতক্ষণ পর শিহাবের মা কথা বললেন।

‘উল্টাপাল্টা কথা বলছি না মা। তোমাদের চোখে হয়তো ভেড়া পড়ে না। কিন্তু কাপ্তান বাজার, কাওরান বাজার বা মাতুয়াইল গিয়ে দেখো, কী পরিমাণ ভেড়া প্রত্যেক দিন বিক্রি হচ্ছে। এখানকার যুবলীগের সভাপতি নাসির ভাইর সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। বিশটা ভেড়া কিনে নাসির ভাইর হাতে তুলে দেবো। উনি নিয়ে স্টেশনে ছেড়ে দেবেন। নাসির ভাইর নিজের ভেড়া মনে করে কেউ আর সেগুলোতে হাত দেবে না। ভেড়াগুলো নিজের মনে খেয়েদেয়ে বড় হতে থাকবে।’

নাবিলা ওর কথা শুনে হাসছে, আবার মুখও বাঁকাচ্ছে। সে দিকে না তাকিয়ে শিহাব বললো, ‘গা থেকে ভেড়ার গন্ধ আসার ভয় নেই। বাসায় আসার আগে এভিয়েশনের পুকুর থেকে গোসল করে আসবো গরুর দুধের সাবান দিয়ে। জাপানীরা গরুর দুধ দিয়ে সাবান বানায়। এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যায়।’

ছোট খালা লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘বুঝ, আমার মনে হয় তোমার ছেলের মাথায় কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওকে রেস্ট রাখা দরকার।’

১২

সালেহার দিকে মোবাইল এগিয়ে দিয়ে নাবিলা বললো, ‘এই নাও, মায়ের সাথে কথা বলো।’

সালেহা মোবাইল কানে দেয়ার আগে জানতে চাইলেন, ‘কে?’

নাবিলা নাম না জানিয়ে বললো, ‘কথা বলে দ্যাখো।’

‘আসসালামু আলাইকুম। আন্টি আমি সিহিয়া। কেমন আছেন?’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ভালো আছি। তোমার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি। কেমন আছো মা?’

‘ভালোই আছি। তবে এখন তো বান্ধবীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, সে জন্য খারাপ লাগে। ভাবছি আপনাদের ওখান থেকে বেড়িয়ে যাবো বেশ কয়েক দিন।’

‘বেশ তো। আসো।’

এরপর মেয়ের সাথে তার বান্ধবীর কী কথা হয়েছিলো, জানেন না। দিন পনেরো আগের কথা এটা। কিন্তু আজ না কি সে বরিশাল চলে এসেছে। এয়ারপোর্ট নেমে নাবিলাকে ফোন করে বলেছে, ‘নাবিলা আমরা রহমতপুর এয়াপোর্টে। তোমাদের বাড়িতে কীভাবে আসবো বলো।’

‘তুমি এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে মেইন রোডে চলে আসো। এসে একটা রিকশা নাও। সাতমাইল বললে যে কোনো রিকশাওয়ালা নিয়ে আসবে। সাতমাইল এসে আমাকে আবার ফোন দেবা। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।’

সালেহার কাছে এসে নাবিলা বললো, ‘মা, আমি তাহলে সাতমাইল গিয়ে দাঁড়াই।’

তিনি কিছু বললেন না। বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্য একটা মেয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল চলে এসেছে—কিছুটা হলেও আশ্চর্যের কথা। ছেলেরা বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যায়। কিন্তু

মেয়েরা এভাবে যায়, তিনি শোনেননি।

যাক, চিন্তা পরে করা যাবে। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমন চাউলের ভাত কি মেয়েটা খেতে পারবে? জীবনে যদি কখনো না খেয়ে থাকে, তাহলে কষ্ট হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। শিহাব শহরে চলে গেছে সেই সকালে।

একটা ছেলে রাখা আছে ফার্ম দেখাশোনার জন্য। সে ভোরে ভোরে সব ডিম খাঁচায় ভরে রাখে। শিহাব সকালের খাবার খেয়ে সেগুলো নিয়ে চলে যায় রূপাতলী। রূপাতলী থেকে ডিম চলে যায় ঢাকা।

তারা বরিশাল আসার আগেই শিহাব মুরগীর ফার্ম করে।

সপ্তাহের এ মাথায় ও মাথায় শুধু বলতো, ‘মা, বরিশাল যাই।’

তিনি জানতে চাইতেন, ‘বরিশাল কী?’

‘আব্বার যেটুকু জমি কেনা ছিলো তা ঠিক আছে কি না দেখে আসি। এখন তো ওরা আরেকটা সুযোগ পেয়ে যাবে।’

এ রকম কয়েক সপ্তাহ পার হওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে এক দিন বললো, ‘মা, বরিশাল থেকে ঘুরে আসি চলো। নাবিলারও তো পরীক্ষা শেষ।’

আসার পর তারা ফার্ম দেখতে পেলেন।

শিহাব বললো, ‘বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছি মা। এক বন্ধু বিদেশ যাবে আরো নয়-দশ মাস পরে। ব্যাংকে ওর টাকা পড়ে আছে। দিয়ে দিলো।’

সালেহার বুক কেঁপে উঠলো। তিনি বললেন, ‘সেই ছেলে সময়মতো টাকা না পেলে তার তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

‘ওর টাকা আমি কয়েক দিন পর থেকেই শোধ করা শুরু করবো মা।’

মুরগীর ফার্ম দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সালেহা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। মুরগীর সাথে হাঁসও আছে কিছু। পুকুরের পাড়ে হাঁসের ঘর। পাড় ঘেঁষে পুকুরের মধ্যে মুরগীর ফার্ম। গন্ধ লাগছিলো নাকে; তারপরও দেখছিলেন। মুখে মুখে ছেলের সাথে রাগ দেখালেন। কিন্তু তিনি কি এ রকমটা চেয়েছিলেন না?

বরিশাল যাওয়ার চতুর্থ দিন রাতে ভাত খেতে বসে শিহাব বললো, ‘মা, টাকা গিয়ে আর কী হবে? আব্বার তোলা এই ঘরে তো সমস্যা শুধু বাথরুম নিয়ে। বাথরুম তুলে ফেললে আর ঝামেলা থাকবে না। আমি যে কোনো এক দিন

ঢাকা গিয়ে মালামাল নিয়ে আসবো।’

‘তুই একা কীভাবে আনবি?’ জানতে চেয়েছিলেন সালেহা। বরিশাল থাকা নিয়ে কোনো কথা বলতে হলো না। ‘তুই একা কীভাবে আনবি?’—এ প্রশ্ন করেই তিনি ছেলেকে সম্মতি দিয়ে দিলেন।

চার দিনের মাথায় ঢাকা থেকে মালামাল চলে এলো। ‘সায়েদাবাদ গিয়ে আগেই একটা বাসের সাথে চুক্তি করেছিলাম। মাত্র এক হাজার টাকায় ঢাকা থেকে বরিশাল পর্যন্ত সব মালামাল নিয়ে এসেছি। আবার এতগুলো লোক এসেছি—এতেও ওরা খুশি।’ শিহাব যখন এ কথা বলছিলো, সালেহা শুধু তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তার কান্নার শ্রোতে বাঁধ দিলেন।

ঢাকা থেকে ছেলের সাথে তার বন্ধুরা সব এসেছিলো। তাতে অবশ্য বিশাল একটা কাজ হয়েছিলো বলে সালেহার কাছে মনে হয়। তার জা এক ফাঁকে প্রশ্ন করে বসলো, ‘এতগুলো পোলাপান কী করতে আইছে ভাবী?’

তিনি স্বাভাবিকভাবে বললেন, ‘এসেছে বেড়াতে।’

‘আমাগো অ্যাহানে বেড়ানের কী আছে?’

‘ও মা, বন্ধুর কাছে এসেছে, বন্ধুর বাড়িতে উঠবে না? কুয়াকাটাও যাবে হয়তো। এখানে দু দিন থেকে সে দিকে যেতে পারে।’

‘ও।’

‘আমি তো মনে করছিলাম শিহাব আবার দলের নেতা অওনের লইগ্গা দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে কি না। নেতা ওইতে গ্যালে আবার পোলাপান দ্যাহান লাগে। অ্যাহানে কেউ জিগায় না দেইখ্খা ঢাকায় গোনে বন্ধু-বান্ধব লইয়া আইছে।’

‘তোমার এ রকম মনে হওয়ার কারণ কী? তুমি মনে হয় জানো না শিহাব কেন কোথায় দৌড়ায়? আর ওর বন্ধুরা যে ঢাকা থেকে আমাদের ঘরের মালামালগুলো আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সাথে এসেছে, সেটাও তুমি জানো।’

তার দেবরের পরিবার যে এভাবে তাদের চলে আসাটা মোটেও সহ্য করতে পারছে না, সেটা তিনি দ্বিতীয় দিন থেকেই টের পাচ্ছিলেন। আজকে একটা খোঁটাও দিয়ে দিলো, তাদেরকে এখানে কেউ জিজ্ঞেস করে না। তার ছেলে-মেয়ে কারো জন্ম এখানে হয়নি; ওরা কোনো দিন এখানে থাকেনি। ওদেরকে

কি সবাই চেনে যে জিজ্ঞেস করবে? না কি তাদের ব্যাপারে এরা যে সবাইকে বলে বেড়াতো, তারা জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়েছেন—এদের সেই মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে বলে প্রতিহিংসায় ভুগছে?

বাড়ির মেয়েরা সব হৈ হৈ করে ছুটে এলো। সালেহার কানে এলো তাদের কথা, ‘নিজাম চাচার ছেলের বৌ এসেছে না কি? চল, দেখে আসি।’

সিঁহিয়ার কানে কি যায়নি কথাটা?

সিঁহিয়ার সাথে ওর চাচা এসেছে। তার হাতে এক ছড়া কলা। সিঁহিয়া জানালো, ‘কারো বাড়িতে খালি হাতে যেতে হয় না। সে জন্য কাকু চোখের সামনে কলা পেয়েছেন, কলা নিয়ে এসেছেন।’

কাকুকে বারান্দায় বসিয়ে সিঁহিয়াকে নিয়ে আসা হলো ভিতরে।

সালেহা বললেন, ‘ও কেবল এসেছে। তোমরা না হয় পরে এসে দেখে যেও।’

তার এ কথা কেউ আমলে নিলো বলে মনে হলো না। সিঁহিয়া আবার যোগ করলো, ‘সমস্যা নেই। আমার খুব ভালো লাগছে। আপনারাও বসুন।’ নাবিলার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আসার কথা ছিলো আব্বুর সাথে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জরুরী কাজ পড়ে গেছে বলে বললেন কাকুর সাথে আসতে। আব্বুর সাথে এলেও গাড়িতে আসা হতো না। তোমাদের এ দিকে আবার ফেরির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সে জন্য উড়ে আসা।’

সালেহা রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন। তার পিছনে পিছনে বাড়ির দু-একজন বৌ এলো। তার কাছে জানতে চাইলো, ‘মাইয়াডা কেডা চাচী?’

‘নাবিলার বান্ধবী।’

‘অনেক সুন্দর কিন্তু।’

যাক কেউ খোঁচা মেরে বলেনি, ‘মুই তো মনে হরছালাম মোগো কোনো আত্মীয় বুঝি।’

আরেক বৌ বললো, ‘ও চাচী, তয় অগো শরবত-টরবত কিছু দেলেন না?’

‘নাবিলা আছে। ও দিতে পারবে। সময়মতো রান্না না হলে তো ভাববে, এত দূর থেকে এলাম; কিন্তু খেতে দিচ্ছে না—মনে হয় আমরা আসাতে এরা খুশি হয়নি।’

যে মেয়ে কথা বলছিলো, সে উত্তরের ঘরের হানিফের বৌ। এবার সে পিঁড়ি

নিয়ে বসে পড়লো। বললো, ‘কী রানবেন চাচী আইজগো?’

‘যা আছে তাই রান্না করবো। শিহাব আসার পর বাজার করাতে হবে। আর ওরা তো চলে যাচ্ছে না, চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

‘দেন, মুই কুইটা দিই।’

‘তোমার রান্না নেই?’

‘মুই তো একলা মানুষ, এক সময় রানলেই ওইবে। অর বাফে আইবে রাইতে। পোলাউগ্গা গ্যাছে জালোকাদি।’

‘ঝালকাঠি...।’

‘মোগো বাড়ি। মায় খালি নাতীরে দ্যাখতে চায়।’

‘তোমার যাওয়া হয় কেমন বাপের বাড়িতে?’

‘বচ্ছরে তিন-চাইর ফির যাওয়া পড়ে। আগে মায় আইতে। অ্যাহন বয়স ওইছে না? হেইল্লুইগ্গা মোরাই যাই।’

‘হানিফের আয়-রোজগার কেমন?’

‘ভালোই আল্লাহর রহমতে। বাফের এক পোলা না? জমিতে ধান য্যা অয় হ্যার তিন ভাগের এক ভাগ লাগে মোগো। আরতা বেইচা দিই। অর বাফের দোহাইনদাও ইনকাম খারাপ অয় না।’

‘দুপুরে খেতে আসে না তোমার স্বামী?’

‘দূর তো কোম না। তিন মাইল ওইবে।’

‘সাইকেল কিনে নিতে বলো।’

‘কইছেলাম। সাইকেল বোলে চালাইতে পারে না। পোলায় ছইল্লা কয় মুই তোমারে চালান শিখাইয়া দিমুআনে। হ্যাও উনি রাজি না। চাচী, মোরে তো কিছু কোটতে দেলেন না।’

‘দেবো। তোমার সাথেই কথা বলে যাচ্ছি। সালামের বৌকে দেখেছিলাম না? সে কোথায় গেলো?’

‘গ্যাছে মনে হয় আন্ধোগো ঘরে আবার। এই বৌগ্গা অ্যাহনো পোলাপানের মতো ছটফট করে।’

‘বয়স তো বেশি না। ছটফট করাটাই স্বাভাবিক।’

‘বিয়া ওইলে আবার কেউ ছোডো থাহে?’ বৌটা মিটিমিটি হাসলো।

সিঙ্ঘার কাকু গ্রামে আসলেন না যেন পানির মাছ পানিতে ফিরে এলো।

তিনি মিনিট দশেক বসেই সিঁহিয়াকে বললেন, ‘আমি ইউ বারোই মা।’
সিঁহিয়া বললো, ‘আপনি কোথায় বের হবেন? কোনো কিছু চেনেন
এখানকার?’

‘চিনন লাগবো না। গ্রামের তো আর গলি নাই। সবখানে সোজা রাস্তা। যেই
রাস্তায় যামু, হেই রাস্তায় আইতে পারমু।’

নারিলা বললো, ‘একটু বসেন চাচা। ডাব পাড়া হচ্ছে, খেয়ে যান।’

‘আইয়া খামুনে মা।’

তিনি বের হওয়ার পর সিঁহিয়া বললো, ‘আমিও তোমার সাথে বের হই,
চলো নারিলা।’

‘তোমাকে দেখার জন্য এখনো কতজন দাঁড়িয়ে আছে, দেখেছো? এদেরকে
রেখে তুমি কোথায় যাবা?’

‘আমি তো সবাইকে বসতে বললাম। কিন্তু কেউ বসলো না।’

‘বসলে তো আর তোমাকে দেখা যাবে না।’

‘তাহলে...।’

‘তাহলে যেটা করবো, সেটা হলো তোমাকে নিয়ে প্রত্যেক ঘরে যাবো।’

‘কতগুলো ঘর তোমাদের বাড়িতে?’

‘আবার দাদারা ছিলেন তিন ভাই। তিন ভাইয়ের ছেলের সংখ্যা আট। সেই
আটজনের আবার মোট তেরোজন ছেলে। তেরোটা ঘরে তো যেতে হবেই।’

‘মানে এই তেরো ঘরের বাইরে আরো ঘর আছে?’

‘আছে তো। তেরোজনের যে সব ছেলে আছে, তাদের মধ্যে দুজন আলাদা
ঘর তুলেছে। তারা অবশ্য ঘর তুলেছে খালের ও পারে। আজ সেখানে না
গেলেও হবে।’

‘না, এভাবে যাওয়া যাবে না।’

‘এভাবে যাওয়া যাবে না মানে?’

‘জালাল কাকু ঠিকই বলেছেন, কারো বাড়িতে খালি হাতে যাওয়া উচিত না।
আমার লজ্জা লাগছে। আগে চলো দোকানে যাই। সেখান থেকে কিছু কিনে
নিই।’

‘দোকানে যেতে হলে কিন্তু হাঁটতে হবে। তিনটা বাড়ি পার হলে তারপর
দোকান।’

‘যত দূর হোক, তুমি চলো।’

দুজনের পিছনে ছোট ছেলে-মেয়েরাও আসতে লাগলো। নাবিলা বললো, ‘তোদের আসা লাগবে না। এটাও তোদের একটা ফুপু। তোরা কী খাবি বলে দে। যা বলবি, তাই কিন্তু পাবি।’

কেউ কিছু বললো না। সিঁহিয়ার দিকে তাকালো সবাই।

সিঁহিয়া বললো, ‘এভাবে কি কেউ খাওয়ার কথা বলতে চায়? তুমি লজ্জা দিচ্ছে কেন ওদেরকে?’

‘লজ্জা? তুমি ওদেরকে চেনো? থাকো দু দিন। টের পেয়ে যাবা।’

‘তুমি তো বেশ সুখেই আছো। এতগুলো ভাতিজা-ভাতিজি।’

‘আরে, এগুলো ভাতিজা-ভাতিজি না ভাজাভাজি।’

‘ভাজাভাজি মানে?’

‘মানে জীবনটা ভাজা ভাজা করে দিচ্ছে ওরা। নিজেই বলেছিলাম বাড়ির সব পোলাপানকে আমি পড়াবো। বিকালে মাদুর পেতে বসে সবাই। কিন্তু পড়ালেখা ঘোড়ার ডিম। আমি তো এ বাড়িরই মেয়ে, তার উপরে আবার পড়াই মাগনা—গুরুত্ব না থাকাই স্বাভাবিক।’

‘তাহলে টাকা নাও।’

‘গুরুতে নিইনি, এখন কি আর নেয়া যাবে? গুরুতে নিলে পরে না নিয়ে পারা যায়; কিন্তু গুরুতে না নিলে পরে আর নেয়া যায় না।’

‘তাহলে এক কাজ করতে পারো। শুভেচ্ছা মূল্যের মতো শুভেচ্ছা বেতন নিতে পারো। প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা করে নেবা।’

‘ধুর, এটা হয় না কি? সবাই হাসাহাসি করবে। এখন কোনো কিছুই করা যাবে না। যদি ওদেরকে পড়ানো বাদও দিয়ে দিই, তাহলে সবাই বলবে দাম বেড়ে গেছে। আর মাগনা পড়ানোর কারণে স্কুলে আমার একটা সুনামও আছে, বোঝো না?’

সিঁহিয়া হাঁটা খামিয়ে নাবিলার দিকে ঘুরে তাকালো। কপাল গুছিয়ে প্রশ্ন করলো, ‘স্কুলে সুনাম আছে মানে?’

‘একটা স্কুলে পড়াই।’

‘তাই? তুমি মাস্টারনী হয়ে গেছো? দারুণ তো। তোমার স্কুলে যেতে হবে।’

‘আচ্ছা, তোমাকে নিয়ে যাবো। সিঁহিয়া, একটা কথা বলবো?’

‘বলো।’

‘সৌন্দর্যের সৌন্দর্য কোথায় বলতে পারো?’

‘বুঝলাম না।’

‘মানে সৌন্দর্য কখন সবচেয়ে আকর্ষণীয়, বলতে পারো?’

‘কী বলতে চাও, বলে ফেলো তো।’

‘সৌন্দর্য যখন পুরোপুরি প্রকাশিত না হয়ে কিছুটা রহস্য রেখে দেয়, তখনি তাতে আকর্ষণ তৈরি হয়। এই যে তুমি আমার দিকে তাকালে, গাছের ফাঁকা দিয়ে রোদ এসে তোমার চেহারায় পড়লো। পুরোপুরি রোদ না, কয়েকটা রেখা। তোমার চেহারায় একটা রহস্য তৈরি হলো। ঢাকা শহরের হাঁ করা খোলা রোদে এ সৌন্দর্য দেখা যায় না।’

‘ওরে বাবা, কী ভাবের কথা! তুমি মনে হয় আমাকে আজকে নতুন দেখছো। আমি সুন্দর না হলে কি আর রাস্তার মধ্যে কেউ বিয়ের কথা বলে?’

‘তুমি আমার কথায় গুরুত্ব দিলে না।’

‘আচ্ছা, এই রাস্তার মধ্যে সৌন্দর্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে না। কোনখানে দাঁড়িয়েছিলাম, চলো। ওখানে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি তুলি। পরে এ নিয়ে গবেষণা করবো।’

পুরো দোকানে একবার চোখ বুলিয়ে সিঁহিয়া জানতে চাইলো, ‘কী নেয়া যায় বলো।’

‘আগে না কি সুপার বিস্কুট পাওয়া যেতো। আধুলির চেয়ে সামান্য একটু বড়। কারো বাড়িতে বেড়াতে গেলে এক প্যাকেট সুপার বিস্কুট নিলেই চলতো। এরপর পাইন্যাপেল বিস্কুটের চল শুরু হয়েছে। তারপর মানুষ বিদেশী ফল নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। বিদেশী ফলে ফরমালিন থাকার কারণে এখন আবার আগেকার দিনের মতো দই-মিষ্টি নিতে দেখা যায়।’

‘তুমি এত কিছু জানলে কোথেকে?’

‘মাস্টারনী না? অনেক কিছু তো জানতে হবেই। এগুলো আবার কাছ থেকে শুনেছি।’

নাবিলা হেসে হেসে কথাটা বললেও সিঁহিয়ার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এখনো কি সহজ হতে পারেনি মেয়েটা? ভিতরে ভিতরে কি শোক রয়ে গেছে? যখনি কোনো একটা প্রসঙ্গ আসে, নাবিলা ওর আব্বাকে হাজির করে। এত বছর পর সিঁহিয়ার নিজেরও কি ভিতরে শোক রয়ে যায়নি? মানুষের মনটা কি একটা হাঁড়ির মতো—যে হাঁড়ি বসিয়ে দেয়া হয়েছে স্থায়ীভাবে? হাঁড়িতে দুধ জ্বাল দেয়া হয়, তার দাগ থেকে যায়। গুড় জ্বাল

দেয়া হয়, দাগ থেকে যায়। তেমনি মনের মধ্যে দুঃখগুলো দাগ ফেলে দেয়। একটা দুঃখের পর আরেকটা দুঃখ এলেও আগের দুঃখের দাগ ঠিকই থেকে যায়।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সিঁহিয়া তাড়া দিলো, ‘বলো তো কী নেবো।’

দোকানদার ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। নাবিলা বললো, ‘আমার বান্ধবী। ঢাকা থেকে এসেছে। আমাদের বাড়িতে সবার ঘরে ঘরে যাবে। কী নেয়া যায় বুঝতে পারছে না। আপনি একটা বুদ্ধি দেন তো কামাল ভাই।’

দোকানদার বললো, ‘সেমাই নেতে পারো। চানাচুর আছে।’

সিঁহিয়া কপাল কুঁচকে বললো, ‘সেমাই?’

‘হ্যাঁ, সেমাই। গ্রামের লোকদের ডায়াবেটিস নেই। সেমাই খেতে তাদের কোনো সমস্যা নেই।’

‘আচ্ছা।’

‘তা ছাড়া সেমাই আমাদের দেশী খাবার। কিন্তু কোম্পানিগুলো নুডুলস বেশি চালানোর চেষ্টা করছে।’

‘তাই?’

‘কারণ কী, জানো? সেমাইর চেয়ে নুডুলসে লাভ বেশি। সেমাই ভাজা লাগে; বেশি দিন থাকে না। কিন্তু নুডুলস বানানো ওদের জন্য সহজ।’

‘তুমি তো দেখা যাচ্ছে নুডুলস বিশেষজ্ঞ।’

‘বিশেষজ্ঞ না। সেমাই যেখান থেকেই আসুক—কারণ বাংলাপিডিয়ায় সেমাই নিয়ে কিছু লেখা নেই—এটা আমাদের দেশী খাবার। সেটা উৎখাতের ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া যায় না, কী বলো?’ নাবিলা হেসে দিলো কথাটা বলে। ‘তোমাকে সেমাই নিয়ে একটা বানানো গল্প শুনাবো।’

সিঁহিয়াও হেসে বললো, ‘আচ্ছা, তাহলে সেমাই আর চানাচুরই নিই, কী বলো?’

‘নাও। আর বাচ্চাদের জন্য নারিকেলের লাডু নিতে পারো।’

‘নারিকেলের লাডু?’

‘হ্যাঁ। দ্যাখোনি কোনো দিন, তাই তো? খুলনার মতো অত বেশি নারিকেল বরিশালে জন্মায় না। কিন্তু বরিশালের সবখানেই নারিকেল আছে। সে জন্য নারিকেলের লাডুও আছে। তোমাকে আগামীকাল নারিকেল বাগান দেখাতে নিয়ে যাবো। বিশাল এক নারিকেল বাগান আছে রহমতপুরে।’

‘কাউয়ার চর নিয়ে যাবা কোথায়?’

‘আরে, কাউয়ার চর না, চরকাউয়া। আচ্ছা, নিয়ে যাবো। চরকাউয়ার চেয়ে কিন্তু সদরঘাটে কাউয়া বেশি। সদরঘাটের কাউয়াগুলোর বাসা হয়তো নদীর ও পাড়ের চরে।’

‘তোমার সেমাইর গল্পটা বলো দেখি, শুনি।’

‘আচ্ছা। গল্প শুনেছি স্কুলের এক ম্যাডামের কাছ থেকে। উনিও না কি এটা বানাননি। ওনার এক মামা আবার এটা বানিয়েছেন। ম্যাডাম আমাদেরকে প্রত্যেক দিন একটা করে গল্প শুনাতেন। গল্পটা উনি কোথায় পড়েছেন বা কোথেকে শুনেছেন সেটা আগে বলে নিতেন।

সেমাইর নাম আগে সেমাই ছিলো না। ছিলো অন্য কিছু। তো, তখন ইংরেজ আমল। এ গল্প যে এলাকার, সেখানে এক লাট আসবে। লাট যে বাড়িতে উঠবে, সে বাড়ির মালিক যতটা সম্ভব খানাপিনার আয়োজন করলেন। সেখানে সেমাইও ছিলো। খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর মিষ্টি পর্বে তাকে সেমাই দেয়া হলো। তিনি এ খাবারটা এর আগে কখনো দেখেননি। খাবারের নাম জানতে চাইলেন তিনি। তাকে বলা হলো। চামচ দিয়ে সেমাই উঠাতে উঠাতে তিনি বললেন, Same as I।

মেজবানের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, এ খাবার আরো আছে কি না। এটা কীভাবে পাকাতে হয় তাও জেনে নিলেন।

তাকে বেশ কিছু রান্না করা এবং কাঁচা সেমাই দেয়া হলো।

দিল্লি যাওয়ার পর তিনি তার স্ত্রীর কাছে এই মজাদার খাবারের কথা বললেন। তবে তিনি এর নাম মনে করতে পারলেন না। তার সাথে যে গিয়েছিলো, তার কাছে নাম জানতে চাইলেন। সেও ভুলে গেছে। তবে তিনি চামচ দিয়ে সেমাই উঠানোর সময় যে কথাটা বলেছিলো, সেটা মনে রাখতে পেরেছিলো। তাৎক্ষণিকভাবে সে বলে দিলো, Same I। সেই থেকে এর নাম হয়ে গেলো সেমাই।

ভুয়া গল্পের মতো মনে হলো?’

‘তা কিছুটা। তবে যেহেতু ইংরেজকে টেনে আনা হয়েছে, সে জন্য সহজে বিশ্বাস করানো যাবে।’

‘আমাদের দেশের লোককাহিনীতে কিন্তু গল্পের চেয়ে ছড়া বেশি—এটা জানো?’

‘আরে, তুমি তো দেখি সত্যিই মাস্টার হয়ে গেছো। আমাকে শুধু জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করছো। গল্প-ছড়া শুনতে এসেছি না কি আমি?’

১৩

সালেহার স্বামী ঘর তুলেছেন রাস্তার দিকে মুখ করে। সে কারণে বেড়া তৈরিতে খরচ হয়েছে ঘর তোলার অর্ধেক টাকা। শ্বশুরের তোলা ঘর জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার দেবর তাদেরকে কোনো কিছু না জানিয়েই দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘর তুলে ফেলে। এর আগে তারা যখন আসতেন তখন শ্বশুরের তোলা ঘরের দোতলায় থাকতেন। কিন্তু সেটা ভেঙে ফেলায় বাধ্য হয়েই তার স্বামীকে নতুন ঘর তুলতে হয়। ঘর তুলতে গিয়ে তাদের ভাগে যে গাছগুলো ছিলো, সেখান থেকে অনেক গাছ কমে যায়। এর বাইরে তাদের আর করার কিছু ছিলো না। নিজেদের টাকা দিয়ে ঘর তোলা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিলো না। যে বছর পুরনো ঘর ভেঙে ফেলা হয়, সে বছর ঈদের ছুটিতে বেড়াতে এসে তাদেরকে আবার ফিরে যেতে হয়। দেবরের ঘরে থাকার যেমন সুযোগ ছিলো না, তাদের কোনো আত্মহও দেখা যায়নি ভাইয়ের পরিবারকে রাখার ব্যাপারে।

তাদের ঘরের মুখ রাস্তার দিকে থাকার কারণে তারা বাড়িতে থেকেও বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন। বাড়ির উঠানের চার দিক ঘিরে বাকি সবার ঘর। অন্য দিকে পুরো বাড়িটাই তাদের ঘরের পিছনে। সে জন্য তাদেরকে কোনো ঘরে যেতে হলে ঘুরে যেতে হয়। আবার কেউ যদি তাদের ঘরে আসতে চায় তাকেও ঘুরে আসতে হয়। কেউ ডাক দিলে হুট করে তিনি যেতে পারেন না। তার জা তাকে যাওয়ার জন্য খবর পাঠিয়েছিলো বিকালের দিকে। বড় হিশাবে তিনি জাকে আসার জন্য বলতে পারেন। কিন্তু তার জা কি তাকে যেতে বলতে পারে? তবুও তিনি মনে কিছু না রেখে গেলেন। তিনি আজীবন অভিযোগের বিরুদ্ধে। মেয়েদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ থাকে স্বামীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি তার স্বামীকে কখনো অভিযুক্ত করেননি। স্বামীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ

নেই, কারণ সংসার নিয়ে তার সে রকম কোনো উচ্চাশা ছিলো না। ছেলে-মেয়ের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কিছু তিনি দেখেন না। তার দেবরের পরিবারের বিরুদ্ধেও তার কোনো অভিযোগ নেই। যেহেতু তাদের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে না, অভিযোগ করলেই যে তারা ঠিক হয়ে যাবে, এমন কোনো কারণ নেই।

তিনি যাওয়ার পর তার জা তার কাছে তার নিজের বা পরিবারের ব্যাপারে কিছু জানতে না চেয়ে যে প্রশ্নটা করলো, তা হলো, ‘ভাবী, শিহাবে বোলে বিয়া করাইতে আছেন?’

‘হ্যাঁ, সে তো গত বছর থেকেই। কেন, কোনো মেয়ের খোঁজ আছে না কি তোমার কাছে?’

‘অ কী? সবাই কওয়াকওয়ি করতে আছে আশ্কের পোলার বৌ অ্যাহন আশ্কের ঘরে, আর আশ্কে মোরে জিগায়ন মাইয়ার কতা?’

‘সবাই বললে সেটা তুমিও বলবা? তুমি জানো না ও নাবিলার বান্ধবী?’

‘হ্যাতে কী ওইছে? বুইনের বান্ধবীরে কি কেউ বিয়া করে না? এডা তো আরো ভালো। সবকিছু জাইন্নাছইন্না লওয়া যায়।’

‘আমি কিচ্ছু জানি না, আর তোমরা আমার ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ফেললা?’

‘মানষের মুখ কি আটকাইয়া রাখতে পারবেন?’

‘জাহেদা, শোনো। মেয়েটার মা নেই, ভাই-বোনও নেই। একা একা থাকে বাড়িতে। দু-একটা দিন বেড়ানোর জন্য আমাদের এখানে এসেছে। সে যদি এখান থেকে কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে যায় সেটা কি ভালো হবে? আর...।’

‘আর’ বলার পর জাহেদা তার দিকে তাকালো। এতক্ষণ সে মনোযোগ দিয়ে পান বানাচ্ছিলো। সে জানে, সালেহা পান খান না। সে তো চায়ের ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু তা না করে পান নিয়ে বসেছে। তিনি বললেন, ‘ও হলো বড়লোকের মেয়ে। ওর আকবার বিশাল ব্যবসা। ওদের সাথে আমাদেরকে মিলাও কীভাবে?’

‘ভাবী, পোলা-মাইয়া বিয়া করাইলে বড়লোক হৌর বাড়ি দেইখখাই বিয়া করাইতে অয়। শিহাব কী কষ্ট করে, দেহি তো।’

‘পুরুষ মানুষ পরিশ্রম করবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমার কাছে কি শিহাব কষ্টের কথা বলেছে?’

‘ও ভাবী, আক্ষে এ রহম কতা কয়ন ক্যা? মাইয়াউগ্গা বোলে দ্যাখতে অনেক সুন্দর।’

‘কেন, তুমি দ্যাখোনি?’

‘ক্যামনে দেখমু? নাবিলা হ্যারে লইয়া এ ঘরে যায়, ও ঘরে যায়। মোগো ঘরে আয় না।’

‘তোমাদের ঘরে সবার শেষে আসবে হয়তো। এখানে সবচেয়ে বেশি সময় দেবে, সে জন্য।’

‘আক্ষের মাইয়ায় কি ভুলেও আয় চাচীর ধারে?’

তিনি মনে মনে বললেন, ও যদি তোমার কাছে না আসে, সেটা ওর জন্য ভালো, তোমার জন্যও ভালো। মুখে বললেন, ‘জাহেদা, তুমি এমন পর করে দেখছো কেন? আমার মেয়ে তো তোমারও মেয়ে। তোমার ছেলে আমারও ছেলে। সবাই একই রক্তের।’

কথাটা বলে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আশোলে কি ওরা একই রক্তের? রক্ত এক হলেই কি একই চরিত্রের হয় সবাই? তার স্বামী আর দেবর আপন দুই ভাই হয়ে এক হলো না। চাচাতো ভাই-বোনেরাও বিপরীত চরিত্রের। সব নদীর পানিই তো এক। কিন্তু সব নদীর চরিত্র কি একই রকম?

সালেহার কথার পিঠে জাহেদা আর কিছু বললো না। যাক, তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে। তিনি বললেন, ‘জাহেদা, আমি তাহলে উঠি। তোমার খোঁজে যদি ভালো কোনো মেয়ে থাকে, তাহলে জানিও।’

আজ তিনি ভালোই কথা বলতে পেরেছেন। তিনি কখনো কারো সাথে কথায় জিততে পারেন না। ছোট বেলা থেকেই তার এ অবস্থা। স্কুলে পড়ার সময় অন্য মেয়েরা তাকে অনেক খারাপ কথা বলে মজা করতো। তিনি সে মজায় অংশ নিতে পারতেন না বা যারা বলতো তাদেরকে নিয়ে উল্টা মজাও করতে পারতেন না। দু-এক দিন মনে হয় মারও খেয়েছেন কোনো কোনো বান্ধবীর হাতে। এক দিন ফিরোজা এসে তার পিঠের উপর দুম করে একটা কিল দিলো। কিলটা ছিলো মজা করার জন্য। কিন্তু সালেহা সেটা বুঝতেই পারলেন না। তিনি কিল খেয়ে মাথা নিচু করে বেঞ্চে সাথে লাগিয়ে দিলেন। ফিরোজা তার পিঠে হাত রেখে মজার কথা বলা শুরু করলো, তিনি আর তাতে যোগ দিতে পারলেন না। কিল খেয়েই তার মন খারাপ হয়ে

গিয়েছিলো। সেই মন খারাপ আর ভালো করতে পারলেন না। তাদের সময় ঝাল মুড়ি বা আচারওয়ালা ছিলো না। এমনকি তাদের স্কুলের সামনে কোনো দোকানও ছিলো না। থাকলে হয়তো ছুটির পর ফিরোজা তাকে ধরে নিয়ে কিছু খাওয়াতো।

ছুটির পর ফিরোজা তার হাত ধরে বললো, ‘তুই আমার সাথে কথা বললি না কেন রে? না কি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিস ধরা খেয়ে যাবি?’

তিনি ফিরোজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

‘বুঝিসনি?’ ফিরোজা বললো, ‘এখন তো বুঝবিই না। চোরের মন পুলিশ পুলিশ।’

তিনি তারপরও ফিরোজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ফিরোজা বললো, ‘তোদের বাড়িতে না কি কাহিনী ঘটেছে? সবাই এটা নিয়ে কথা বলছে; আর তুই এমন ভাব ধরছিস! না কি সবার কথা থেকে বাঁচার জন্যই আগে থেকে এ রকম ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিস?’

‘আমাদের বাড়িতে কাহিনী ঘটলে সে জন্য আমাকে কেন কথা শুনতে হবে? আমাদের বাড়িতে তো শুধু আমরা থাকি না। আমাদের পুরো গুপ্তি থাকে।’

‘তোদের বাড়ির মোতালেব পুরান বাড়ির নারিকেল গাছে লুঙ্গি ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে। বাড়িতে যে সে নেটু অবস্থায় গিয়ে উঠেছে, তোরা জানিস না?’

‘একটা ছেলে কাপড় খুলে দৌড়েছে, তাতে তোর এত মজা কেন রে?’

‘তোর তো লাগবেই। তুই কি আশোলেই কাহিনী জানিস না, না কি চেপে যাচ্ছিস রে?’

‘তোর মুখেই শুনি।’

‘শোন তাহলে। মোতালেব গিয়েছিলো জাহাঙ্গীরের কাছে। রাতে সে জাহাঙ্গীরদের বাড়িতেই থেকে যায়; ঘুমায় জাহাঙ্গীরের লুঙ্গি পরে। ভোর রাতে মনে হয় পানির তৃষ্ণা লেগেছিলো, বেচারা জাহাঙ্গীরদের পাকের ঘরে গিয়ে কীভাবে পানি খাবে? জাহাঙ্গীরকে ঘুম থেকে তুলতেও মনে হয় খারাপ লাগছিলো। তাই গাছে উঠে ডাব পেড়ে খাওয়ার চিন্তা করলো। আলম চাচাও তখন টয়লেট থেকে কেবল বেরিয়েছে। আওয়াজ পেয়ে হাতের টর্চ মারলো উপরের দিকে। বেচারা মোতালেব বললেই তো পারতো, কান্ধু, আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। সে জন্য গাছে উঠেছি ডাব পেড়ে খাবো বলে। তা না করে

সে লুঙ্গি রেখে দিলো পুকুরে ঝাঁপ। আলম চাচা সেই লুঙ্গি সকাল বেলা বাড়ির সবাইকে দেখালেন। জানা গেলো, লুঙ্গি জাহাঙ্গীরের। জাহাঙ্গীর তখন কাহিনী ফাঁস করে দিলো। আহ বেচারা! জাহাঙ্গীরদের বাড়ির কুলসুম চাচী তার মেয়ের জন্য মনে মনে মোতালেবের কথা ভেবে রেখেছিলেন। এখন কি আর তিনি এই নেংটু চোরের কাছে মেয়ে দেয়ার কথা বলতে পারবেন কারো কাছে?’

ফিরোজাকে তিনি সে দিন কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে জাহেদাকে উচিত কথা বলতে পেরেছেন।

দু বান্ধবী এর মধ্যে ঘরে ঢুকেছে। নাবিলাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ‘এর মধ্যে ঘরে ঘরে যাওয়া শেষ?’

‘অনেক ঘরে চাচারা চলে এসেছে। সে জন্য সিঁহিয়া আর যেতে চাইলো না। আগামীকাল যখন চাচারা বের হয়ে যাবে তখন আবার যাবো।’

বারান্দার দু দিকে দুটো চকি। এক চকিতে নাবিলা আর সিঁহিয়া বসা। আরেক চকিতে বসলেন সালেহা। সিঁহিয়ার কাছে তিনি জানতে চাইলেন, ‘সিঁহিয়া, রাতে কী খাবা বলো। আমাদের পুকুর নেই। সে জন্য পুকুর থেকে ধরে তাজা মাছ খাওয়াতে পারছি না। খালেও এখন কোনো মাছ পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে দু-একটা মেনি মাছ দেখা যায়। ঢাকার মতো এখানেও বরফ দেয়া মাছ কিনে খাই। তবে হাঁস-মুরগী আছে নিজেদের। হাঁস খাবা না মুরগী খাবা বলো।’

‘আন্টি, এখনি খাবো? বাজে তো কেবল আটটা।’

‘না, পরেই খাওয়া হবে। শিহাব আর তোমার কাকু আসুক। তরকারি কষানো আছে। যেটা খাবা সেটা রান্না করবো। আচ্ছা, তোমার কাকু গেলো কোথায়?’

‘বহু দিন পর গ্রামে আসতে পেরে উনি খুব খুশি। গেছেন হাঁটতে।’

‘এই রাতের বেলাও কি হাঁটছেন?’

‘হাঁটতেও পারেন। জোনাকি দেখছেন হয়তো।’

‘জোনাকি কি আর এখন দেখতে পাওয়া যায়? জোনাকি থাকে ঝোপের মধ্যে। ঝোপ বলতে কিছু আছে কোথাও? তুমি তোমার কাকুর খোঁজ নাও।’ সিঁহিয়া ওর জালাল কাকুকে ফোন দিলো, ‘কাকু, আপনি কোথায় গেলেন?’

ঢাকায় আপনি তেলওয়ালা হাঁস খুঁজেই পান না। উনি আপনার জন্য তেলভর্তি হাঁস রান্না করেছেন। দেরি করলে আবার তেল জমে যাবে।’

‘আমি তো বাজারে আছি।’

‘বাজারে কী করেন?’

‘এই তো, শরবত খাইলাম। স্পেশাল পুলিশের শরবত।’

‘পুলিশের শরবত মানে?’

‘পুলিশের শরবত মানে পুলিশের গুলাইয়া শরবত বানায় না। ব্যায় শরবত বানায়, হ্যায় আগে পুলিশে চাকরি করতো। এল্লাইগা এইডার নাম পুলিশের শরবত।’

‘আচ্ছা, শরবত খাওয়া শেষ হলে আসেন তাড়াতাড়ি।’

নাবিলা পাশ থেকে বললো, ‘আমি ওনাকে ডাবের পানি সাধলাম, সেটা না খেয়ে এখন উনি পুলিশের শরবত খাচ্ছেন।’

সিঙ্ঘিয়া সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে বললো, ‘চলো, একটু হেঁটে আসি।’

সালেহা বললেন, ‘এই রাতের বেলা কোথায় হাঁটতে যাবা?’

‘সাপ তো নেই আন্টি। হেঁটে আসি একটু এ দিক ও দিক।’

সিঙ্ঘিয়ার হাত ধরে নাবিলা বেরিয়ে গেলো।

দুটো পেয়ারা গাছ, একটা আম গাছ, আরেকটা কাঁঠাল গাছ—এটাকে বাগান বললে বাগান, ভিটি বললে ভিটি। লম্বায় হাত দশেক আর প্রস্থে তিন হাতের মতো। এর মাঝে আবার নাবিলা ফুল গাছও লাগিয়েছে। সেখানে এসে বসলো দুজন। ঘরের বাইরে ঝুলানো বাতির আলো এসে পড়াতে আলো-অন্ধকারের একটা মিশেল তৈরি হয়েছে। জুতা রেখে তার উপরে বসলো ওরা।

নাবিলা বললো, ‘আসার পর থেকে তো হাঁটার উপরেই আছো। কেমন লাগছে বলো।’

‘এখনি কীভাবে বলবো? আগে ঘুরে দেখি সব কিছু, তারপর। তোমার কেমন লাগছে সেটা বলো। ঢাকা থেকে এসে গ্রামের মেয়ে হয়ে গেলো।’

‘আরে, এখানে গ্রামের কিছু আছে না কি? ঢাকার সাথে এখানকার তফাতটা কী?’

‘ঢাকার সাথে এখানকার তফাত বাতাসে। জালাল কাকু বলেন, উনি বাড়ি

থেকে আসার পথে যখন ঢাকায় ঢোকেন, তখনি দম আটকানো বাতাস টের পান। আমারও মনে হচ্ছে সে রকম।’

‘আর?’

‘এখানে টিউবওয়েলের তাজা মিষ্টি পানি আছে।’

নাবিলা যোগ করলো, ‘ঢাকার কালো আকাশের বদলে আমাদের এখানে একটা নীল আকাশ আছে।’

সিঁহিয়া আকাশের দিকে তাকালো। মশলা মাখানো চাঁদ দেখা যাচ্ছে পুব দিকে। কিছুক্ষণ পর রঙটা ঝলসে উঠবে। দু-এক দিনের মধ্যে পূর্ণিমা হবে বোঝা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়েই বললো, ‘কালো আকাশ থেকে পয়সা ঝরে পড়ে। সে কারণে মানুষ ঢাকা ছাড়তে চায় না।’

‘তাহলে তুমিও গ্রামে থাকতে চাও?’

‘তা জানি না। গ্রাম পছন্দ করি। সবাই গ্রাম পছন্দ করে। থাকতে চাই কি না এখন কী করে বলবো? তোমার মতো অনেক দিন থাকলে বুঝতে পারতাম।’

‘থেকে যাও। বাড়িতে তো তুমি বলতে গেলে একাই থাকো। এখানে না হয় তোমার আবু সপ্তায় সপ্তায় এসে দেখে যাবেন। প্লেনে আসবেন, প্লেনে চলে যাবেন।’

থাকতে পারলে তো কতই ভালো হতো! এমনি থাকা নয়; একটা অধিকার নিয়ে থাকা। অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সিঁহিয়ার জানা নেই।

নাবিলার কাছে কি বিষয়টা বলা যায়? ‘নাবিলা, বান্ধবী হিশাবে তোমার কাছে একটা কথা বলতে চাই। অন্যভাবে নিও না।’ এভাবে শুরু করা যায়।

নাবিলার সম্মতি পাওয়ার পর বলা যায়, ‘তোমার ভাইয়াকে আমার ভালো লাগে।’

নাবিলা কী করবে? বলার পর ওর চেহারার দিকে তাকাবে। তারপর বলবে, ‘তোমার মাথা কি ঠিক আছে?’

‘কেন, আমাকে কি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে? আমি তো স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বলছি। মাথা ঠিক না থাকলে স্বাভাবিক কথা বলতে পারার কথা না।’

‘সিঁহিয়া, তুমি ভালো করেই জানো—এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। আবার বয়স আর পরিস্থিতির কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনাও বদলায়। এখন যা ভাবছো, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর এটাকে ছেলেমানুষি বা পাগলামি বলে মনে হবে।’

সিদ্ধিয়া কি তখন বলতে পারবে, ‘আমার আব্বু ব্যবসা করে, তোমার ভাইয়াও ব্যবসা করে’?

হয়তো বললো। জবাবে নাবিলা বলবে, ‘হ্যাঁ, যারা বাদাম বিক্রি করে তারাও তো ব্যবসা করে।’

‘এভাবে না বলে বলো, কাজী ফার্মসের ব্যবসা আর তোমার ভাইয়ার ব্যবসা একই। কাজী ফার্মসের মালিকের বয়সী হলে তোমার ভাইয়া তাদের চেয়েও বড় ব্যবসায়ী হতে পারে।’

এই ফাঁকে গুগলে সার্চ দিলো সিদ্ধিয়া। কাজী ফার্মসের মালিক কাজী জাহেদুল হাসান। ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা ছেড়ে উনি এই ব্যবসায় এসেছেন। উনি বুঝতে পেরেছেন, বাড়ি না হলেও মানুষের চলে; কিন্তু খাবার ছাড়া মানুষ বাঁচে না।

‘কতজনেই তো কত কিছু হতে পারে। কিন্তু কে কী হতে পারবে বা পারতো সেটা দেখে তো কাউকে বিবেচনা করা হয় না। বিবেচনা করা হয় কে কী পারে সেটা দেখে।’ নাবিলা বলবে।

শেষ পর্যন্ত নাবিলা হয়তো সম্মত হলো, ও ওর ভাইয়াকে বিষয়টা জানাবে। ওর ভাইয়া কী করতে পারে? শুনে হাসবে। বলবে, ‘সংসার কাকে বলে এখনো বোঝে না তো, সে জন্য এক রকম কল্পনার সাগরে ভাসছে। তোর বান্ধবী আবার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে না তো? তাহলে আরেকটু ভেসে থাকতে বল। যে জাহাজের অপেক্ষায় আছে, সে জাহাজ না এসে যদি অন্য জাহাজ এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, তখন আগের জাহাজের কথা ভুলে যাবে। শুধু ভুলে যাবে না, সেই জাহাজের ধ্বংস কামনা করবে।’

আর কী বলতে পারে? ‘আমার বৌ হলে তো মুরগীর গু ছানা লাগবে। পারবে মুরগীর গু ছানতে? তুই এক কাজ কর। আগামীকাল তোর বান্ধবীকে বুড়িতে ডিম ভরতে বলবি। তাহলেই চলবে। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।’

তাহলে বিষয়টা কাউকে কোনোভাবে বলা যাবে না? আব্বুকে কি বলা যায়? আব্বু শুনে চোখ সরু করে ফেলবে। বলবে, ‘মেয়েদের মধ্যে সংসারী হওয়ার চিন্তা আসা ভালো। কিন্তু নিজের মনের মতো সংসার গড়ে তুলতে না পারলে মেয়েরা হতাশ হয়। তুমি তো ওখানে গিয়ে নিজের মনের মতো সংসার গড়ে তুলতে পারবা না। এ বাড়ি তোমারই। তুমি চাইলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাড়িটাকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি। এখানে তুমি তোমার মনের

মতো সংসার গড়ে তোলো। সেই ছেলে যদি সব বাদ দিয়ে এখানে আসতে চায়, তাহলে আমি ভেবে দেখতে পারি। তার নিজের ব্যবসা গড়ে তুলতে আমি সাহায্য করবো।’

সিহিয়া বলবে, ‘আব্বু, আমি একা থাকতে চাই না। একা একাই তো বড় হলাম। আমি আশেপাশে মানুষ নিয়ে থাকতে চাই।’

ওর আব্বু বলবে, ‘হুম। আমি তোমাকে আরো বেশি সময় দেয়ার চেষ্টা করবো।’

জালাল কাকুকে দিয়ে বলাতে গেলেও ওর আব্বু একই কথা বলবেন। গল্পের মধ্যে মেয়েরা মৃত মায়ের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। বাস্তবে কি মৃত মায়েরা এ রকম কোনো পরামর্শ দেন? আমরা যাওয়ার পর প্রত্যেক দিনই তাকে স্বপ্নে দেখতো সিহিয়া। এখনো দেখে; তবে মাঝে-মধ্যে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ পায়নি আজ পর্যন্ত।

সিহিয়া ওর কথা বলতে পারবে না। কাউকে বলতে পারবে না। সাগরে যেমন হাঙ্গর থাকে, তেমনি ডলফিনও থাকে। সাগর হাঙ্গরের কথা জানান দিতে চায় না। সে জানান দেয় ডলফিনের কথা। মানুষও তার কিছু কথা জানাতে চায় না; কিছু কথা জানাতে চায়। ডলফিনের আকর্ষণে সমুদ্র প্রেমিকরা সাগরে নামে। সাগরের কোনো কষ্ট আছে কি না সিহিয়া জানে না। কিন্তু ওর ভিতরে কষ্ট জমা হচ্ছে। ও যেটা জানাতে চাচ্ছে তা কোনোভাবে জানানো যাচ্ছে না। নিজের ভিতরের ডলফিনগুলোকে চেপে রাখার কষ্ট বাড়ছে কেবল।

সিহিয়া বললো, ‘কোথায় পড়বে-টড়বে ভেবেছো?’

‘বিএম কলেজ যেহেতু হাতের কাছেই আছে, খুব একটা চিন্তা করছি না। একটা কিছু নিয়ে পড়া যাবেই। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও ওখানে যাওয়া-আসাটা একটু ঝামেলার হয়ে যাবে। তুমি?’

‘আমাকে যেহেতু প্রাইভেটেই পড়তে হবে, সেখানে প্রতিযোগিতাও কম, সে জন্য আমিও বলতে পারো দুশ্চিন্তা করছি না। তোমার ভাইয়া কি...।’

ধুর, নাবিলার ভাইয়ের কথা চলে এলো আবার। কথার মধ্যে যদি প্রকাশ পেয়ে যায় নাবিলার ভাইয়ার ব্যাপারে ও আগ্রহ দেখাচ্ছে, তাহলে নাবিলা কী মনে করবে?

নাবিলা বললো, ‘ভাইয়ার লেখাপড়ার কথা বলছো তো? ফাইনাল পরীক্ষা

দেয়ার ব্যাপারে কোনো অগ্রহ ছিলো না ভাইয়ার। কিন্তু মায়ের কথায় পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো রেজাল্ট হয়নি। ও নিয়ে ভাইয়ার মধ্যে কোনো অগ্রহ নেই। কিন্তু আমি পড়ালেখা করতে চাই। ওমুক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারলাম না বলে আমার পড়ালেখা শেষ হয়ে যাবে—এ রকম কোনো চিন্তা আমার মধ্যে নেই।’

‘ঠিক বলেছো। কী যেন প্রবাদ আছে না? জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো। তেমনি শিক্ষা হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।’

‘শিক্ষা হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো—এ কথায় দুজনে সুর মিলিয়ে হেসে উঠলো।

নাবিলা বললো, ‘চলো ঘরে যাই।’

‘আরেকটু পরে যাবো। এখন চাঁদের সাথে রাস্তায় হাঁটবো।’

‘আমি কি চলে যাবো?’

‘কোথায়?’

‘ঘরে।’

‘কেন?’

‘তুমি বলছো চাঁদের সাথে হাঁটবা। চাঁদের সাথে একা হেঁটে মজা।’

‘একাই হাঁটবো। তুমি পিছনে থেকো। একটু ভয় তো আছেই, বোঝো না? হঠাৎ সামনে থেকে একটা বাদুর উড়ে গেলো, তখন ভয় পেয়ে যেতে পারি। কিংবা একটা হাঁদুর দৌড়ে গেলো পায়ের উপর দিয়ে।’

‘ধান ক্ষেতের হাঁদুরেরা রাস্তায় আসে না। রাস্তায় আসে ছুঁচো।’

‘ধুর, কী এক নোংরা জিনিশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছো! নাম শুনলেই বমি আসে।’

‘খাওয়ার সময় হতে এখনো দেরি আছে। কথা বলতে বলতে ততক্ষণে ভুলে যাবা।’

‘নাবিলা, পাটি নিয়ে আসো না। শুয়ে শুয়ে গল্প করতে ইচ্ছা করছে।’

‘আচ্ছা, আনছি। তুমি ভয় পাবা না তো?’

‘ভয়ের কী আছে?’

‘আছে। তুমি হয়তো তাকিয়ে আছো সামনের দিকে। দূরে কোথাও কলা গাছের একটা গুকনা পাতা বাতাসে দুলছে। সেখানে তেমন আলো নেই। তোমার কাছে মনে হবে কেউ আছে ওখানে।’

‘আচ্ছা, এ রকম কিছু দেখলে কলা পাতা মনে করবো। ভয় পাবো না।’
 ‘কলা পাতাই যে হবে—এমন তো আর কোনো কথা নেই। অন্য কিছুও হতে পারে।’

‘অন্য কিছুটা কী?’

‘সত্যিই কোনো মানুষ হতে পারে।’

‘মানুষ হলে এত দূর থেকে দেখবে না। এত দূর থেকে কিছু দেখা যাবে না।’

‘সবাই কি শুধু চেহারা দেখার জন্য তাকায়?’

‘তুমি যাও তো, পাটি নিয়ে আসো। এতই যখন ভয় দেখাচ্ছো, না হয় তোমার সাথে আমিও যাই।’

‘আচ্ছা, তুমি থাকো। আমি যাচ্ছি।’

নাবিলা আর সিঙ্হিয়া পাটিতে শুয়ে আছে। দুজন মাথা এক জায়গায় রেখে পা কোনাকুনি দুই দিকে দিলো। পরপর কয়েকটা সেলফি তুললো সিঙ্হিয়া।

‘নাবিলা!’

‘হঁ।’

‘আমার যেহেতু কোনো বোন নেই, সে জন্য আমি চাই আমার যাতে একটা মেয়ে হয়।’

নাবিলা হেসে দিলো। ‘বিয়ের খবর নেই, তুমি মেয়ে বানিয়ে বসে আছো।’

‘আরে, দশ বছর পর তো আমার একটা মেয়ে থাকতে পারে, যে সব বুঝবে। তোমার সাথে এখন যেভাবে শুয়ে আছি, আমার মেয়ের সাথেও এভাবে আমি প্রত্যেক রাতে শুয়ে গল্প করবো। বোনের সাথে যে গল্পগুলো করতে পারিনি সেগুলো করবো।’

‘তোমার মেয়ে যদি তোমার সাথে গল্প করতে না চায়? সে যদি শুধু তার বাপের সাথে গল্প করতে চায়?’

‘তা হতে দেবো না। জন্মের পর থেকেই মেয়েকে হাত করতে হবে। আমার কিন্তু আম্মুর সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিলো। মেয়েরা বাপকে বেশি পছন্দ করে কেন, বলতে পারো? বাপেরা ওদেরকে মারে না, বকা দেয় না। মায়েরা সারা দিন এটা করতে পারবা না, ওটা করতে পারবা না, এটা পরো, ওটা খাও—এগুলো বলতে থাকে।

বাচ্চারা যদি সারা দিন বাপের কাছে থাকতো আর বাপকে সারা দিন পর দু ঘণ্টার জন্য পেতো তাহলে উল্টাটাই হতো।’

‘হুঁ। তুমি তো দেখা যাচ্ছে সংসার নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করো।’

‘কী আর করবো? একা থাকলে তো চিন্তা এমনিতেই চলে আসে।’

‘হুম। যাক, তুমি দশ বছর পরের চিন্তা করে ফেলেছো। আমি ভাই আগামী বছরের চিন্তাই করতে পারিনি এখনো।’

‘তোমার চিন্তার কী আছে? মা আছে, বড় ভাই আছে বাপের জায়গায়।’

‘আকাশে যেমন একটা সূর্য, একটা চাঁদ আর অসংখ্য তারা দেখা যায়, তেমনি আমার মধ্যে একটা বড় চিন্তা আছে, ঠিক তার পিছনে আরেকটা বড় চিন্তা। বড় চিন্তাগুলো সব সময়ের জন্য। আর এগুলো ঘিরে আছে ছোট ছোট অনেক চিন্তা। বড় চিন্তাটা সূর্য। তার পিছনেরটা চাঁদ। আর এগুলোকে ঘিরে থাকা ছোট চিন্তাগুলো তারা। আমার মনে হয় সবার মধ্যেই এ রকম চিন্তা আছে। কেউ গুরুত্ব দেয়, কেউ দেয় না; কেউ বলে, কেউ বলে না।’

‘তোমার বড় চিন্তাটা শুনি তো।’

‘এটা বলা যাবে না। গোপন। তুমি তো তোমার মেয়েকে শুনাবা, আমিও সে রকম আপন কাউকে শুনাবো।’

ঘরে ঢুকে নাবিলা বললো, ‘গলা দিয়ে যদি মোটা চালের ভাত না ঢুকতে চায়, তাহলে বোলো। পাটায় পিষে দেবো।’

‘সালেহা ধমকের সুরে বললেন, ‘এভাবে বলছিস কেন? না খেতে পারার কী আছে? একটু বেশি চাবাতে হবে, এই তো।’

সিঙ্ঘিয়া হেসে বললো, ‘আন্টি, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি খেতে পারবো। তরকারির সাইজের তুলনায় তো ভাতের সাইজ অনেক ছোট। তরকারি যদি চাবানো যায়, ভাতও চাবানো যাবে।’

মোটা চালের ভাত খেতে সিঙ্ঘিয়ার কষ্ট হবে কি না সে বিষয় নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন সিরিয়ার কোনো এক বাবা তার শিশু সন্তানকে শুকনো রুটি খাওয়াতে গিয়ে অঝোরে কাঁদছেন। এক সময় তিনি তার ছেলেকে পনির দিয়ে পাউরুটি খেতে দিতেন। যেখানে ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয় সেখানে তিনি তার ছেলের জন্য রুটি জোগাড় করতে পেরেছেন—এটাই বেশি। শুকনো রুটি ছেলের গলা দিয়ে ঢুকছে না। এ দৃশ্যে বাবা যখন অঝোরে কাঁদছেন তখন ছেলে তাকে উল্টা সান্ত্বনা দিচ্ছে, তুমি কেঁদো না আব্বু। আমি ঠিকই এটা খেতে পারবো।

লেখকরা জীবন সংগ্রামের কথা লেখেন। কিন্তু তাদের লেখা জীবন সংগ্রামের মধ্যে এ সব কাহিনী খুব কম থাকে। লেখকরা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখেন, তাদের অভাব-বঞ্চনা-দুঃখের কথা লেখেন। কিন্তু যারা কোনো শ্রেণীতে পড়ে না, তাদেরকে নিয়ে লিখতে চান না। লেখকরা সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন। শ্রেণীহীনরা যেহেতু সমাজের অংশ নয়, তাই তাদেরকে নিয়ে লেখার দরকার নেই।

১৪

গাড়ির রাস্তায় যে রকম তীর চিহ্ন থাকে, তেমনি মানুষের জীবন চলার পথেও তীর চিহ্ন দেয়া থাকে। গাড়ির ইন্ডিকেটরের মতো মানুষের ভিতরেও

ইন্ডিকেটর আছে। কেউ যদি লেখা না পড়ে শুধু তীর চিহ্ন দেখে গাড়ি চালাতে থাকে তাহলে তার ভুল রাস্তায় যাওয়াটাই স্বাভাবিক। জীবনের রাস্তায় চলতে গেলেও তীর চিহ্ন আর লেখা দেখে এগুতে হয়।

শিহাব তখন ক্লাশ এইটে পড়ে। বন্ধুদের প্রতি দিনের রুটিন ছিলো বিকালে হাটতে হাটতে নতুন কোনো রাস্তা বা জায়গা আবিষ্কার করা। সে দিন সালেহিন বললো, ‘কী করবি? চল, তালতলার নতুন রাস্তা দিয়ে আইনুসবাগ হয়ে ঘুরে আসি। আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।’ ওদের নিয়ম ছিলো যে রাস্তা দিয়ে যাবে, সে রাস্তা দিয়ে আর ফিরবে না। কিন্তু সে দিন ফিরতে হয়েছিলো। কারণ রাস্তাটা তখনো বানানো শেষ হয়নি। তিন শো মিটারের মতো তখনো বাকি।

মানুষের তৈরি রাস্তায় ফিরে আসা যায়। কিন্তু জীবন চলার পথে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। জীবনের রাস্তাটা সিনেমায় দেখানো বুলন্ত ব্রিজের মতো—পিছন থেকে খুলে পড়ে যেতে থাকে।

শিহাব ওর গাড়ির ব্যাপারে বলতে পারে, ঠিকমতো তীর চিহ্ন দেখে সব লেখা পড়ে এগুচ্ছে কি না। কিন্তু নিজের ব্যাপারে বলতে পারে না। ব্যস্ত সড়কে লেখা পড়ার জন্য গাড়ি থামানোর সুযোগ নেই। আগে থেকেই পড়ে আসতে হয় রাস্তার পাশে কী লেখা আছে। জীবনের চলার রাস্তার মতো ব্যস্ত সড়ক দ্বিতীয়টি আর নেই। আগেভাগে কোনো একটা রাস্তা বেছে নিতে হবেই।

শিহাব এখন অটো চালায়। কলেজের লেকচারার হতে গিয়েও কেউ যদি সেটা বাদ দিয়ে স্কুলে এসে পড়ানো শুরু করে, সেটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। হ্যাঁ, উন্মত্ত প্রেমিক হলে এমনটা কেউ করতেও পারে। ঐ স্কুলে হয়তো তার প্রিয়তমাও আছে। অথবা তার স্ত্রী ঐ এলাকায়ই অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। আর কলেজ অন্য জেলায়। স্ত্রীকে চাকরি ছেড়ে নিজের কাছে চলে আসতে না বলে সে নিজেই স্ত্রীর কাছে চলে এসেছে।

কিন্তু শিহাব কেন এসেছে গ্রামে? অবসর জীবন কাটানোর জন্য গ্রামে ফিরে আসার ধারা তো এখন বলা যায় বন্ধ। হাতে গোনা দু-একজন মুরব্বি এক সময় ঢাকায় চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন; এখন শেষ বয়সে গ্রামে চলে এসেছেন সুস্থভাবে বাঁচার জন্য। সেখানে শিহাব জীবন শুরু করতে এসেছে গ্রামে। গ্রাম থেকে জীবন শুরু করে কি শেষ জীবনে গিয়ে

শহরে উঠতে হবে?

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে চাবি হাতে যখন ঘরের দিকে মুখ করেছে, তখন দেখতে পেলো সামনে মা দাঁড়ানো। এটা প্রতি দিনের দৃশ্য। রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঢোকানোর আওয়াজ শুনেই বোধ হয় ওর মা ঘর থেকে বের হয়ে যান। অথবা প্রতি দিনকার বাড়ি ফেরার সময় যেহেতু মোটামুটি নির্দিষ্ট, হয়তো তিনি প্রস্তুত হয়েই থাকেন। এটা নিয়ে ও কোনো দিন মাকে কোনো প্রশ্ন করেনি। এটা অজানাই থাক। ভালোবাসায় কিছু গোপনীয়তা থাকাই ভালো। প্রত্যেক দিন ওর মা এসে দাঁড়াবে, আর ও বলবে, ‘তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি তো আসছিই।’

ওর মা কোনো জবাব দেবেন না।

ও ঘরের দিকে হাঁটতে থাকবে, ওর মা পিছন পিছন আসবেন। ঘরে ঢুকে দেখবে বারান্দায় চেয়ারের কাঁধে লুঙ্গি-গামছা ঝুলানো। এটা কে ঝুলায় তাও জানা হয়নি। হয়তো ওর মা-ই ঝুলান অথবা মা নাবিলাকে বলে রাখেন ঝুলিয়ে রাখতে। টেবিলের উপর চাবি ছুঁড়ে মেরে লুঙ্গি-গামছা নিয়ে ও চলে যায় বাড়ির সামনের পুকুরে। পুকুরের পাশে মসজিদ। ঘাটলার শুরুতে শান বাঁধানো বেঞ্চি আছে। এই রাতেও মুরব্বিদেবের দু-একজনকে পাওয়া যায়। কেউ না থাকলেও আওয়াজ শুনে ইমাম সাহেব বেরিয়ে আসবেন। ইমাম সাহেব বয়সে তরুণ। ওর চেয়ে ছোট না বড় তা বুঝা যায় না। বয়সে ছোট-বড় হলেও তফাতটা দু-এক বছরের বেশি হবে না। বেচারী সারা দিনে মনে হয় কথা বলার মতো কাউকে পান না। বাড়িতে থাকেন মুরব্বির। তাদের কথার বিষয় পছন্দ হওয়ার কথা না। তা ছাড়া তারা কথা বলতে চান, শুনতে চান না।

বেঞ্চিতে কেউ নেই। তবে শিহাবের কাশির আওয়াজ শুনে ইমাম সাহেবকে দরজা খুলতে শোনা গেলো।

‘শিহাব ভাই না কি?’ ইমাম সাহেব গলা বাড়িয়ে জানতে চাইলেন।

‘হ্যাঁ। কী খবর আপনার?’

‘এই তো, রাতের খাবার খেলাম। আপনি চলে গেলে ঘুমের প্রস্তুতি নেবো।’

‘কী খেলেন আজকে?’

‘ভালোই। আপনাদের ঘর থেকে খাবার এসেছে আজকে।’

‘আমাদের ঘর থেকে এসেছে বলে খাবার ভালো? না কি আমার সামনে

বলতে চান না?’

‘না, আপনাদের ঘর থেকে কখনো খারাপ খাবার আসে না। ভালো খাবার মানে দামী খাবার দিতে হবে এমন তো আর কোনো কথা নেই। আর আমি যদি প্রত্যেক দিন দামী খাবার খাই তাহলে দেখা যাবে বয়স চল্লিশ হওয়ার আগেই রগের মধ্যে চর্বি বানিয়ে বসে থাকবো। কিন্তু বাসি খাবার তো দেয়া উচিত না, কী বলেন?’

‘যারা বাসি খাবার দেয় তাদের খাবার ফিরিয়ে দেবেন। দরকার হয় সে দিন দোকান থেকে মুড়ি কিনে গুড় দিয়ে খাবেন। ফিরিয়ে দিলে উচিত শিক্ষা হবে।’

‘পরে তো এ নিয়ে বিচার বসবে।’

‘বিচার বসলেই ভালো। আমাকে একটু জানিয়ে রাখবেন। খাবার দেয়াটা যাদের কাছে ঝামেলার, তারা টাকা দেবে। খাবার দেয়া হয় বলেই তো আপনার বেতন কম।’

‘বাদ দেন তো ভাই। লজিং বাড়ির চেয়ে তো অনেক ভালো আছি।’

‘লজিংও ছিলেন না কি আপনি?’

‘ছিলাম তো। ছয় বছরের মতো।’

‘ছয় বছর লজিং ছিলেন, গলায় কেউ ঝোলেনি?’

চাঁদের আলোয় ইমাম সাহেবের হাসি দেখা গেলো, ‘তাহলে কি আর ইমাম হতে পারতাম?’

‘লটর-পটর না করলেই হয়। পছন্দ হওয়া মাত্র শুভ কর্ম।’

‘আশোলে আমার ভাগ্যে কোনো ছাত্রীই ছিলো না।’

‘ছাত্রীই যে হতে হবে এমন কোনো কথা আছে না কি? ছাত্রের খালা-ফুফু কত কিছু থাকে!’

‘ছাত্রের মায়েরা ছিলো। বয়স কম হলেও তাদেরকে চাটীই ডেকে এসেছি।’

‘কেউ কিছু বলেনি?’

‘কেউ কেউ বলেছে বোন ডাকতে। আমি জবাব দিয়েছি, আদমের ছেলে-মেয়েরা সবাই ভাই-বোন।’

‘কিন্তু সবাইকে বোন ডাকা যায় না, তাই তো?’

ইমাম সাহেব কোনো জবাব দিলেন না।

গামছা দিয়ে শরীর ঘষামাজা শেষ করে শিহাব ঘাটলার শেষ ধাপে নেমে দশ-

বারোটা ডুব দিলো। গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বললো, ‘আপনি বিয়ে করছেন না কেন?’

‘বিয়ে কে না করতে চায়? কিন্তু নিজে নিজে কি আর...।’

‘কেন, আপনার বাপ-চাচার?’

‘বাপ-চাচা থাকলে তো।’

শিহাব চুপ করে গেলো। এই লোকটার সাথে এত দিন ধরে কথাবার্তা চলছে, কিন্তু তার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানা হলো না।

ইমাম সাহেব বললেন, ‘আপনি তাহলে জানেন না। আবার কথা আমার মনে নেই। বড় ভাইয়ের সংসারে বড় হয়েছি। মা মারা গেলেন বছর তিনেক আগে। সে জন্য বাড়ি যাওয়ারও খুব একটা টান নেই। ভাতিজা-ভাতিজিগুলোর জন্য শুধু ঈদের সময় যাই।’

‘আপনার বাড়ি মঠবাড়িয়া না?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে আমাদের এখানেই থেকে যাওয়ার চিন্তা করেন। নাবিলাদের স্কুলে না কি কয়েকজন ম্যাডাম খালি আছে। আপনি রাজি থাকলে খোঁজ-খবর নেয়া যায়।’

ইমাম সাহেব চুপ।

শিহাব বললো, ‘তার মানে আপনার কোনো সমস্যা নেই?’

মাঝারি নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, ‘ভাই, একে তো আমি এখানে উদ্বাস্তর মতো। তার উপর আবার বিয়ে করলে বাসা ভাড়া করতে হবে। মসজিদের দেয়া কামরায় তো আর বৌ নিয়ে থাকা যাবে না।’

‘ভাড়া করতে হবে না। কত ঘর খালি পড়ে আছে আমাদের বাড়িতে! আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।’

‘আমার মতো নাম-পরিচয়হীন...।’

‘আজকালকার মেয়েরা তো শ্বশুর-শাশুড়ী নেই এমন শ্বশুর বাড়িই খোঁজে।’

শিহাবের গোসল প্রায় শেষ। লুঙ্গি পাল্টানোর কারণে দু জনের কথার মধ্যে বিরতি চলে এলো। লুঙ্গি ধুয়ে ঘাটলা বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বললো, ‘ঢাকায় তো ইমাম হিশাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য দুটো শর্ত থাকলে তার মধ্যে একটা থাকবে ইমামকে বিবাহিত হতে হবে। আপনি অবিবাহিত হয়েও কীভাবে টিকে গেলেন সেটা জানা দরকার। সবার সামনে প্রসঙ্গটা তুলতে

হবে। অবিবাহিত ইমাম মানে হলো অপূর্ণাঙ্গ ইমাম। আমরা একজন অপূর্ণাঙ্গ ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে পারি না, কী বলেন?’

শিহাবের হাঁটা থামলো না। ওর ভিতরে অন্য চিন্তা কাজ করছে। ঘরে ঢুকে ভিন্ন একটা কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে। সেই কণ্ঠটা নাবিলার সাথে কথা বলছে। পরিচিত মনে হচ্ছে কণ্ঠটাকে। কিন্তু মনে পড়ছে না কার। এ বাড়ির মেয়েদের গলা তো মোটামুটি মুখস্থ। নাবিলার স্কুলের কেউও রাতের বেলা আসার কথা না। এই রাতের বেলা কে এসেছে?

মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে এগুচ্ছে শিহাব। ইমাম সাহেব পিছন থেকে ডাকছিলেন। তাতেও কোনো সাড়া দেয়নি। ওর বাম হাতে লুঙ্গি ঝুলানো। ঘাড় গামছা। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনি দিয়ে নিচের ঠোঁট টিপছে।

ঘরের চালের বাড়তি অংশের নিচে ঝুলানো বাঁশে লুঙ্গি-গামছা মেলে দিতে দিতে শুনলো নাবিলা থেকে বলছে, ‘ভাইয়া, ভিতরে এসো না। মানুষ আছে।’

শিহাব বললো, ‘মানুষ আছে মানে কী? মানুষের ঘরে তো মানুষই থাকবে। বাঘ বা সাপ থাকলে না হয় কথা ছিলো—কাছে যাওয়ার আগে চিন্তা করে নিতে হতো।’

এ কথায় সিঁহিয়া ঠোঁট বাঁকালো। হাসির কোনো আওয়াজ হলো না।

নাবিলা কথা চালিয়ে নিলো, ‘তুমি বারান্দায় বসে থাকো। আজকে খেতে দেরি হতে পারে। একজন মেহমান আছেন। উনি এলে ওনার সাথে বসে তুমি খাব। এখন চাইলে মুরগীর ঠ্যাং খেতে পারো।’

ছোট বেলা থেকেই শিহাবের স্বভাব মুরগীর পা মাথা গিলা কলিজা খাওয়া। ওর মা যখন রান্না করতেন, চুলা থেকে কড়াই তোলার আগেই একটা বাটি বা পিরিচে পছন্দের জিনিশগুলো নিয়ে খাওয়া শুরু করতো। নাবিলা যখন খাওয়া শিখলো, তখন ওর সাথে এ নিয়ে ঝগড়া হতো। শিহাবের যা যা পছন্দ, নাবিলারও সে সব খেতে হবে। নাবিলা আগে থেকেই মায়ের কাছে বসে থাকতো, যাতে ভাইয়া আসার আগেই সব দখল করা যায়। পরে আবার নাবিলার পছন্দের তালিকা থেকে গিলা আর পা বাদ পড়ে যায়। এগুলো নোংরা থাকে, তাই এগুলো খাওয়া যাবে না।

শিহাব বললো, ‘দে, ঠ্যাং চাবাই। কী আর করার? কিন্তু মেহমানটা কে?’

নাবিলা উঠে রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, ‘চিন্তা কোরো না। খালাদের কেউ তোমার হবু শ্বশুর বাড়ির লোকদেরকে পাঠায়নি।’

বাতাসে যখন পর্দা নড়াচড়া করছিলো, তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে শিহাব দু বার চেষ্টা করলো ভিতরে তাকাতে। কিন্তু মেয়েটা বসে আছে অন্য দিকে ফিরে।

নাবিলা পিরিচে মুরগীর পা এনে টেবিলে রাখলো।

শিহাব বললো, ‘এত ঢং করছিস কেন? কে এসেছে, বলতে পারিস না?’

‘বলতে পারবো না কেন? কিন্তু তোমার কোনো মেহমান আসেনি।’

‘আচ্ছা, তোর মেহমানই এসেছে। তুই ধন্য হয়ে গেছিস। এখন বল।’

‘সিঙ্ঘিয়ার কথা কি বলেছিলাম তোমাকে?’

নাবিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো শিহাব।

নাবিলা বললো, ‘তাহলে তোমার মনে নেই। আমার বান্ধবী। ও আর ওর চাচা এসেছে।’

পিরিচটা ঠেলে দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে আয়না-চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়ানো শুরু করলো শিহাব।

‘কী, খাবা না?’ নাবিলা জানতে চাইলো।

‘না। মাকে এক ফাঁকে আসতে বল।’

‘তাহলে শরবত দিই, খাও।’

‘আচ্ছা, দে। আর দস্তরখান, জগা, গ্লাশ, লবণ—এগুলো আনা শুরু কর।’

‘ওগুলো রেডি করাই আছে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।’

আয়নার দিক থেকে মুখ তুলে শিহাব বললো, ‘তোকে আনতে বলেছি, এখানে এনে রাখবি। রেডি করা আছে কোথায়? এখানে রেডি করে রাখবি।’

নাবিলা লেবুর শরবত এনে শিহাবের সামনে রেখে আবার চলে গেলো ভিতরে। কোনো কথা বললো না। গিয়ে বসলো সিঙ্ঘিয়ার সামনে।

সিঙ্ঘিয়া বললো, ‘তোমার ভাইয়ার কি খুব বেশি রাগ?’

‘হ্যাঁ, রাগ আছে। আবার কোনো রাগ ছিলো না। ভাইয়ার নিজের রাগের সাথে আবার যেটুকু থাকার দরকার ছিলো তাও যোগ হয়েছে।’

সিঙ্ঘিয়ার ধারণা ছিলো দুই ভাই বা দুই বোনের মধ্যে সম্পর্ক অল্প-মধুর হলেও ভাই-বোনের সম্পর্ক সব সময় মধুর। কিন্তু নাবিলার ভাইকে যতটুকু সময় দেখেছে বোনকে বাড়ির উপরেই রাখতে। অবশ্য ঢাকায় থাকতে এক দিন আর আজকে—এই দু দিন মিলে এক ঘণ্টার বেশি ও তাকে দেখেনি।

খাওয়ার সময় শিহাবদের খুব একটা কথা হয় না। ওরা যে দস্তরখানটা ব্যবহার করে, সেটা ওর আবার বানানো। খয়রী রঙের পপলিন কাপড়। সালেহা আবার সেটার উপরে সাদা সুতা দিয়ে ফুল তুলেছেন। দস্তরখান যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য দস্তরখানের উপরে এখন আবার পানি রঙের পলিথিন বিছিয়ে দেয়া হয়। খেতে বসলে পরিবারের কর্তার কথা সবার মনে আসে। সে জন্যই হয়তো অন্য কথা খুব একটা আসে না।

কিন্তু এখন তো কথা বলতেই হবে। জালাল কাকু আছেন। লোকটাকে শিহাবের কাছে খুব ভালো লাগলো। দেখে মনে হয় না তার মধ্যে কোনো রকম দুশ্চিন্তা আছে। এ বয়সে মানুষ রোগ-ব্যাধিতে কুঁকড়ে থাকে। কিন্তু তার মধ্যে অসুস্থতার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। প্রাণবন্ত একজন মানুষ। লোকটা সরল এবং সপ্রতিভ। খুব সহজে মিশে যেতে পারছে। আধুনিক লোক।

শিহাব জানতে চাইলো, ‘কেমন দেখলেন গ্রাম?’

‘আপনাগোর এ দিকে মানুষ অহনো অনেক গাছ লাগায়। এইটা খুব ভাল।’

‘গাছ তো ঢাকায়ও লাগানো হয় প্রত্যেক বছর।’

‘হ, আষাঢ় মাসে লাগায়, ভাদ্র মাসে নাই।’

‘গাছ দেখলেন শুধু? আর কিছু দেখলেন না?’

‘শোনেন বাবা, যেইখানে গাছ বেশি আছে, সেইখানকার মানুষের মনগুলোও গাছের মতন তাজা থাকে।’

‘তাহলে ঢাকার মানুষের মন মরা?’

‘মরাই তো। তাগোর জীবনে কোনো সুখ আছে?’

শিহাব জালাল কাকুর পাতে ভাত তুলে দিতে গেলে তিনি বাম হাতটাকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করলেন। শিহাব বললো, ‘আপনারও তো দেখি পেটের ভিতরটা মরে গেছে। কতটুকু ভাত খেলেন?’

‘আরে না, এখন বয়স হইছে না? কম বয়সী গাছে যেই পানি টানে, ভিতরে শোলা হওয়া গাছ কি আর সেই পানি টানতে পারে?’

‘তাহলে আপনার ভিতরে শোলা হয়ে গেছে?’

‘তা তো হইছেই। কিন্তু গাছের ভিতরে শোলা হইলেও গাছে প্রতি বছর নতুন পাতা গজায়। মানুষের ভিতরে শোলা হইলে আর তার শরীরে নতুন কিছু

গজায় না ।’

১৫

দুই বান্ধবী গলাগলি করছে। কান্নাকাটিও চলবে হয়তো কিছুক্ষণ। শিহাব তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। রেক্সি গাছে একটা হলদে পাখি বসে আছে। সেটা দেখছে। হলদে পাখিটাও এক দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরভাবে। হয়তো কোনো শিকারের দিকে চোখ রাখছে। প্রত্যেকেই তার শিকারের দিকে চোখ রাখে। কিন্তু নিজে কখন শিকার হয়ে যায় সে খোঁজ রাখে না।

পাখিটা কি পুরুষ না মহিলা? পাখি দেখলে মানুষ সেটাকে মেয়ে বলেই ধরে নেয়। পাখিরা সুন্দর বলেই কি? কিন্তু পশু-পাখির মধ্যে ছেলেরা বেশি সুন্দর হয়। আবার শিকারী পাখির কথা বললে মানুষ ধরে নেয় উল্টোটা। বাজ বা চিল দেখলে প্রথমেই সেটাকে মেয়ে পাখি বলে মনে নিতে মন চায় না। কিন্তু শিকার তো মনে হয় ছেলে পাখিদের চেয়ে মেয়ে পাখিরাই বেশি করে। মেয়ে পাখিদেরকে বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দিতে হয়। প্রত্যেক দিনই এ বাড়ির কারো না কারো হাঁস-মুরগীর বাচ্চা চিলের পেটে যায়। এ বাড়ি কেন, সব বাড়িতেই এ ঘটনা ঘটে। এ শিকারগুলো কি বেশির ভাগই মেয়ে চিলেরা করে না? আচ্ছা, যখন সাপের কথা বলা হয় তখন নারী-পুরুষের কথা মনে আসে না কেন? সাপ অতি ভয়ঙ্কর বলে? ভয়ের কারণে নারী-পুরুষ ভাবার সময় থাকে না? পোকাকার বেলায় মানুষ প্রথমে কোন লিঙ্গ ধরে নেয়? স্ত্রী, পুরুষ না কি ক্লীব? পিপড়ার বেলায় আমরা কী ভাবি? মাকড়সা দেখলে? মেয়ে মশারাই না কি শুধু কামড়ায়। গায়ে মশা বসলে কি আমরা সেটাকে মেয়ে মশা বলে মনে করি? প্রাণী জগতে কামড়াকামড়িতে মনে হয় মেয়েরাই এগিয়ে আছে। শিহাব ছোট বেলায় বাচ্চাওয়ালা মুরগী খুব ভয় পেতো। একবার উড়ে এসে এক মুরগী ওকে ঠোকর দিয়েছিলো। তারপর থেকে মুরগীর প্রতি ভয় ছিলো অনেক দিন যাবৎ।

হলদে পাখিটা উড়ে গেলো। শিহাব চোখ নামিয়ে ফেললো। জালাল কাকু

ব্যাগ নিয়ে আগেভাগে গিয়ে গাড়িতে বসে আছেন। আসার সময় ব্যাগ ছিলো দুটো। এখন তিনি তিনটা বানিয়েছেন। কলা নিয়েছেন তিন পদের। বিচি কলা, অগ্নি সাগর কলা, কবরি কলা। ঢাকায় কবরি কলার নাম এখন বাংলা কলা হয়ে গেছে। বরিশালে বহু আগে থেকেই এর নাম কাঁঠালী কলা।

শিহাব বললো, ‘চাচা, গাড়িতে গরম না? বাইরে এসে দাঁড়ান।’

‘আরে না, কই গরম? থাকি না এইহানে।’

‘আরে, আসেন না। কথা বলি। আপনার নিজের ব্যাপারে তো কিছুই জানলাম না এখনো।’

শিহাব অনেক মানুষের অনেক কাহিনী জানে। কোনো সময় যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বলতে থাকে, সেগুলো ওর কানে যায়; কখনো যাত্রীরা সেধে ওর সাথে কথা বলে। কাহিনীগুলো শোনা পর্যন্তই শেষ। কাউকে আর বলা হয় না। বলার সময়ই বা কোথায়? ওর যখন বৌ হবে, তখন থেকে বৌকে এসে মানুষের কাহিনীগুলো শোনাবে।

নাবিলা বললো, ‘আবার কবে আসবা বলো।’

‘যখন মন চাইবে তখনি আসবো।’

সালেহা পাশ থেকে বললেন, ‘এসো। এভাবে ছুট করে চলে এসেছো, কিছু করতেও পারলাম না।’

‘এত কিছুর পরও আপনি বলছেন কিছু করতে পারলেন না?’ সিঁহিয়া ঘুরে বললো।

‘শীতকালে এসো। আরো বেশি মজা পাবা। কলাই ক্ষেত, খেজুরের রস, জিওল মাছ—কত কিছু পাবা তখন! তখন এ রকম এসেই চলে গেলে হবে না। সময় নিয়ে আসবা।’

‘খাবার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না?’

‘পাওয়া যাবে না কেন?’ নাবিলা বললো, ‘ধুলা পাওয়া যাবে।’

‘সেটা তো ঢাকায়ও পাওয়া যায়।’

‘ঢাকায় পাওয়া যায় ময়লা ধুলাবালি। আর এখানে পরিষ্কার ধুলা। শুধুই ধুলা।’

‘আচ্ছা, শীতকালে আসবো গায়ে ধুলা মাখতে।’

‘গায়ে না, পায়ে। পায়ে ধুলা মাখার মজাই আলাদা।’

‘তোমাকে তখন কষ্ট করে এক বালতি পানি বেশি টানতে হবে।’

‘তোমার গোসলের পানি আমি টেনে দেবো কেন?’

‘ও মা, আমি মেহমান হয়ে আসবো না? মেহমানকে দিয়ে তো আর তুমি কাজ করাবা না।’

গোসল করার জন্য টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে এনে নাবিলাদের বাথরুমের বালতিতে রাখতে হয়। সেই পানি দিয়ে নাবিলা আর ওর মা গোসল করে। আজকে সিহিয়া গোসল করার সময় নাবিলা জানালো, ওর ভাইয়ার হাতে টাকা এলে মটর বসাবে। তখন আর পানি টেনে আনতে হবে না।

‘হুঁহ। আগে আসো, তারপর দেখা যাবে।’ নাবিলা মুখ বাঁকিয়ে বললো।

রাতে যে চিন্তাটা করে রেখেছে, গাড়িতে বসে মনে মনে সেটার মহড়া শুরু করলো সিহিয়া। ওর দৃষ্টি রাস্তার পাশে গাছের দিকে। গাছগুলো লাইন ধরে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে। মোটা গাছ, চিকন গাছ; বয়স্ক গাছ, কম বয়সী গাছ।

তিনটা উপায় চিন্তা করা আছে। প্রথমত বিদায় নেয়ার সময় শিহাব নিশ্চয়ই বলবে, ‘পৌছে ফোন দিও।’

তখন ও বলবে, ‘আপনার নম্বরই তো নেয়া হয়নি। ফোন দেবো কীভাবে?’ এটা ঠিক, শিহাবের কাছ থেকে নম্বর নেয়া হয়নি। কিন্তু নাবিলার মোবাইল থেকে সিহিয়া নম্বরটা টুকে নিয়েছে।

সিহিয়া তখন শিহাবের দিকে মোবাইল বাড়িয়ে দেবে।

নম্বর রেকর্ড করতে গিয়ে অন্তত দু বার চোখে চোখ পড়বে। তখন নাবিলা একটা আবেদন রেখে যাবে।

শিহাব যদি বিদায় দেয়ার সময় কিছু না বলে, সিহিয়া নিজেই বলবে, ‘ভাইয়া, দোয়া করবেন।’

তখন সে বলবে, ‘আচ্ছা, যাও।’

সে বলবে, কিন্তু সিহিয়া তার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়েই থাকবে। এতে কি সে কিছু বুঝতে পারবে না?

তৃতীয় উপায়টা হলো বিদায় নেয়ার কিছুক্ষণ পর তাকে একটা এসএমএস দেয়া। এসএমএসের ভাষাটা কী হবে সেটা এখনো ঠিক হয়নি। একবার

চিন্তা করেছিলো লিখবে, ‘ভাইয়া, আপনাকে দেখে শ্রদ্ধা জেগে উঠলো। আপনার কাছ থেকে অনেক শেখার আছে।’ এ কথায় কি কিছু বুঝতে পারবে সে? না কি ফেরার অনেক দিন পর একটা এসএমএস পাঠিয়ে জানতে চাইবে, ‘ভাইয়া কেমন আছেন?’ কিছু দিন পর জানতে চাইবে, ‘ঢাকা আসবেন কবে? এলে আমাদের বাসায় অবশ্যই আসবেন।’ এতে অবশ্য একটা ঝুঁকি আছে। লোকটা কি না নাবিলাকে গিয়ে বলে, ‘তোর বান্ধবী আমাকে এসএমএস পাঠায় কেন?’ এ কথা বললে সব শেষ।

যদি মজা করে বলতে পারতো, ‘ভাইয়া, ভাড়া নেবেন না?’

তখন সে শিহাব বলবে, ‘হ্যাঁ, দিনের প্রথম যাত্রীরাই ভাড়া না দিয়ে যাবে এটা কেমন কথা? দাও ভাড়া।’

‘সৌজন্য ভাড়া...।’

সিহিয়া তখন এক টাকার একটা কয়েন এগিয়ে দেবে। শিহাব যত্ন করে সেই কয়েনটা মানিব্যাগে রেখে দেবে। ওদের যে দিন বিয়ে হবে, সে দিন মোহর যা ধরা হবে, ও বলবে তার সাথে এক টাকা যোগ করে নিতে। এক লাখ এক টাকা হলে এক লাখ নগদ, আর এক টাকা থাকবে বাকি। সেই এক টাকা বাসর ঘরে ঢোকার পরে শিহাব দেবে সিহিয়াকে। এই কয়েনটাই তখন আবার সিহিয়ার হাতে আসবে।

শিহাব বলবে, ‘এই কয়েনটার কথা কি তুমি মনে করতে পারো?’

সিহিয়া তাকিয়ে থাকবে শিহাবের দিকে।

শিহাব বলবে, ‘আমাদের বাড়ি থেকে রহমতপুর এয়ারপোর্টে এসেছিলো আমার অটোতে চড়ে। তখন তুমি ভাড়া হিসাবে এই কয়েনটা দিয়েছিলো।’

‘এখন সেটা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে?’

‘ফিরিয়ে দেবো কেন? মোহর হিসাবে যে টাকা দিয়েছি সবই আমার আয় করা টাকা থেকে দিয়েছি। এটাও আমার আয় করা।’

সিহিয়া কয়েনটাকে খুব যত্ন করে রেখে দেবে। কাচের বাকশে যেভাবে খেলোয়াড়দের কাপগুলো সাজিয়ে রাখা হয়, সেভাবে।

শিহাবের মনে পড়ে, গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় ওরা লঞ্চের পাটাতনে যেতো। লঞ্চের গেট দিয়ে ঢোকার সময় প্রথমে যে সিঁড়িটা, সেই সিঁড়ির গোড়ায় লেখা থাকতো, ‘প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের প্রবেশ পথ।’ প্রথম শ্রেণীর

যাত্রী কাদেরকে বলে সেটা ও জেনেছে অনেক পরে।

টাকা থাকলেও সবুজ অবশ্য কখনো কেবিনে যায় না। সবুজ ওর বড় মামার ভক্ত। ওর বড় মামা থাকেন নেভাডায়। আর ওদের নানা বাড়ি ভোলার লালমোহন। ঢাকা থেকে লঞ্চ আসা অনেক আরামের। কিন্তু তিনি কেবিন ভাড়া করবেন না। কেবিনে চলাচল না করার পিছনে তার যুক্তি হলো, ‘লঞ্চ যদি ডুবে যায়, আমি তো আর কেবিনের মধ্যে টের পাবো না। দরজা-জানালা আটকে ঘুমাবো। পাটাতনের লোকেরা লাইফবয় নিয়ে যে যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আশেপাশে লোকজন থাকলে তারা তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। আর আমি? আমি কেবিনের মধ্যে ইঁদুর মারা কলে ইঁদুর যেভাবে মরে থাকে সেভাবে মরে থাকবো। তোরা গিয়ে লাশটাও পাবি না।’

শিহাবের গাড়িতে যে যাত্রীরা যায় তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণী হয় না। আজকের যাত্রীরা আরো ভিন্ন। ‘যাত্রীরা’ও ঠিক না; যাত্রী বলা যায়। দুজন যাত্রীর মধ্যে একজন বিশেষ যাত্রী আছে। লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে দেখেছে, মেয়েটা একবারের জন্যও সামনে তাকায়নি। এমনকি ঘাড় ঘুরিয়ে হাত ঘড়িতে সময় দেখা বা মোবাইলে চোখ রাখার কাজও করছে না। বাইরে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

অনেক রকম যাত্রী ওঠে গাড়িতে। কেউ ওঠার কয়েক সেকেন্ডের মাথায় বিমানো শুরু করে। বন্ধুরা মিলে একবার নাইট কোচে ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গা গিয়েছিলো। সাধারণ বাসের মতো সে গাড়িতে ড্রাইভার আর যাত্রীদের মধ্যে কোনো বেড়া ছিলো না। রাতের বেলা যাত্রীরা তো ঘুমাবেই। কিন্তু ড্রাইভারের পাশের যাত্রীকে সুপারভাইজার মোটেও ঘুমাতে দিলো না। বেচারী যখন চোখ বুজতো, সুপারভাইজার তার সাথে আলাপ শুরু করে দিতো, ‘ভাইজান চা খাবেন?’

লোকটা চোখ মেলে বলতো, ‘চা?’

‘হ্যাঁ, চা। ফ্লান্সে চা আছে। আসেন দুজন মিলে চা খাই।’

লোকটা হ্যাঁ-না কিছু বলতো না। সুপারভাইজার তখন বলতো, ‘আপনি মনে হয় মনের সন্দেহ এখনো দূর করতে পারেননি—চায়ের মধ্যে কী না কী আছে! খেয়ে হয়তো লম্বা ঘুম শুরু করবেন, আর আমরা আপনার সব কিছু নিয়ে আপনাকে রাস্তায় গুইয়ে রাখবো। অবশ্য আমরাই বলি অপরিচিত লোকের দেয়া কিছু খাবেন না। আমাদের বাসেও কথাটা লেখা আছে।’

সুপারভাইজার উপরের দিকে তাকিয়ে লেখাটা খোঁজা শুরু করে। চোখ নামিয়ে গল্প শুরু করে, ‘একবার তো ইফতারের খেজুর খেয়ে আমার সব খোয়া গেলো। সব বলতে আমার কাছে ছিলো তখন একটা কম দামী মোবাইল আর তিনশো টাকা। আমি তখন একটা ইনশুরেন্সে চাকরি করি, বুঝলেন? আমার ওফিশ মতিঝিলে, বাসা উত্তরায়। উত্তরা থেকে ট্রেনে আসা-যাওয়া করি। সে দিন ওফিশে দেরি হয়ে গেছে। ট্রেনে ওঠার পর ইফতারের আর মিনিট বিশেক বাকি ছিলো। তাড়াহুড়ার মধ্যে ইফতারির জন্য যে এক বোতল পানি কিনবো, তাও মনে ছিলো না। তো, ইফতারির আগে আগে এক ভদ্রলোক তার ব্যাগ থেকে খেজুর আর পানি বের করে ইফতারির আয়োজন শুরু করলেন। বেশির ভাগ যাত্রীর কাছেই পানি ছিলো। আমার মতো লোকের সংখ্যা ছিলো দু-একজন, যাদের কাছে কিছুই ছিলো না। লোকটা সবাইকে তার খেজুর সাধা শুরু করলো। মোটামুটি সবাই নিলো। খেজুর দিয়ে ইফতারি শুরুর পর সেই যে আমি ঘুম দিলাম, আমার ঘুম ভাঙলো পরের দিন দুপুরে। কপাল ভালো, ট্রেনটা ছিলো টাঙ্গাইলের। যদি খুলনার হতো, তাহলে আরো ভালো হতো। আমার বাড়ি খুলনায়, বুঝলেন? সমস্যা হতো যদি চট্টগ্রাম, সিলেট বা রাজশাহীর ট্রেন হতো তাহলে।’

যাত্রীর মাথা ততক্ষণে হেলে পড়েছে। সুপারভাইজার তার কাঁধে নাড়া দিয়ে আবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। এরপর বলতে শুরু করলো, ‘বুঝলেন ভাই, টাঙ্গাইল স্টেশনের এক বেঞ্চিতে আমি শুয়েছিলাম। বেঞ্চির নিচে দেখি একটা কুকুরও ঘুমাচ্ছে। যারা আমাকে বেঞ্চিতে এনে শুইয়ে দিয়েছে, তাদেরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। নিচে পড়ে থাকলে তো কুকুরের সাথেই ঘুমাতে হতো। ঘুম ভাঙার পর আস্তে আস্তে কাউন্টারের দিকে আগালাম।

কাউন্টারের লোকটা আমাকে দেখে বললো, ঘুম ভাঙলো তাহলে?

বুঝলাম, এরা সব জানে। হয়তো আমাকে বেঞ্চিতে শুইয়ে দেয়ার ব্যাপারে এই লোকটারও ভূমিকা ছিলো। পথের লোকদের সবচেয়ে বেশি উপকার করা করে, জানেন? পরিবহনের লোকেরা। ড্রাইভার-কন্ডাক্টর-হেল্পার—এরা বহু পথের লোককে খাওয়ায়। পথে থাকার কারণে তারা এই লোকগুলোর কষ্ট দ্যাখে, বোঝে।

গাড়িতে শিহাবের ঘুম হয় না। শিহাব ছিলো তৃতীয় সারির সিটে। বসে বসে সুপারভাইজারের কাণ্ড দেখছিলো। ড্রাইভারের পাশের যাত্রী ঘুমিয়ে পড়লে সে

ঘুম ড্রাইভারের মধ্যে সংক্রমিত হবে; ড্রাইভার ঘুমের মধ্যে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে। ড্রাইভারকে সজাগ থাকতে হলে তার পাশের লোককেও সজাগ থাকতে হবে।

রাস্তায় তীর চিহ্ন আঁকা। একটা তীর গেছে এয়ারপোর্টের দিকে মুখ করা; আরেকটা ঢাকা-বরিশাল হাইওয়ের দিকে। অটো রিকশা থেকে নেমে সিঙ্স্থিয়ারা তখনো এয়ারপোর্টের দিকে মুখ ফেরায়নি; কিন্তু শিহাব ওর গাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে। গলা বাড়িয়ে চাচাকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, ‘চাচা, বাসায় পৌঁছে ফোন দিয়েন।’

গাড়িতে আসতে আসতে কথাটা রেডি করে রেখেছিলো সিঙ্স্থিয়া। কিন্তু সেটা বলার আগেই শিহাবের গাড়ি চলা শুরু করেছে। সিঙ্স্থিয়া শুধু উচ্চারণ করেছিলো, ‘ভাইয়া।’ এটুকুও কি শিহাবের কানে গেছে?

সিঙ্স্থিয়ার কান্না চলে আসছে। সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, যাতে চাচা না দেখেন। চাচা বললেন, ‘চলো, ভিতরে গিয়া বসি।’

‘আপনি হাটুন কাকু। আমি আসছি।’

সিঙ্স্থিয়া তাকিয়ে রইলো একই দিকে। রাস্তা ফাঁকা। কালো পিচের রাস্তার উপরে সাদা রঙের তীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে শুধু।

সিঙ্স্থিয়া ওর মনের মধ্যে জাল ফেলতে শুরু করলো। ও কেন এসেছিলো?